IS-১১০২

Semester Final Exam

ইসলামী আকীদার প্রশ্নোত্তর

সূচীপত্র

১। ক) ইসলামী আকীদা ও ঈমানের পরিচয় দিন। ২
খ) ইসলামী জীবনাদর্শে এর গুরুত্ব মূল্যায়ন করুন।..... ২
২) ক) তাওহীদ বলতে কী বুঝেন? ৩
খ) মানব জীবনের তাওহীদের গুরুত্ব এবং তা বাস্তবায়নের উপায়-আলোচনা করুন। "তাওহীদুল ইবাদতেই কাফিরদের আপত্তি" প্রমান করুন।..... ৪
৩। ক) ইসলামের মূল ঘোষণা কোনটি? এর কয়টি অংশ রয়েছে?..... ৬
খ) ইসলামের মূল ঘোষণার প্রথম অংশের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন। ৭
৪। ক) ইলাহ-এর পরিচয় দিন। ৮
খ) ইলাহ সম্পর্কে জাহেলী মতবাদ বিস্তারিত লিখুন।..... ৮
প্রশ্ন-৫। কালিমায়ে তাইয়্যেবার শিক্ষা বিস্তারিত লিখুন।..... ১০
প্রশ্ন-৬: ক) শিরক-এর পরিচয় দিন এবং এর প্রকারভেদ আলোচনা করুন। ১১
খ) 'শিরক ও বর্তমান মুসলমান' একটি পর্যালোচনা উপস্থাপন করুন। ১৩
৭। ক) রিসালতের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করুন। ১৩
খ) মহানবী (সাঃ) এর খাতমে নবুওয়াত কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রমান করুন এবং এতে বিশ্বাসের আবশ্যকতা বর্ণনা করুন। ১৪
৮। ক) মু'জিযা কী?..... ১৬
খ) হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মানুষ ছিলেন নাকি অলৌকিক সত্ত্বা? এ বিষয়ক মতভেদ ও এর সমাধান কুরআন ও হাদীসের আলোকে বর্ণনা করুন। ১৬
৯। ক) আসমানী কিতাব কয়টি ও কী কী?..... ১৭
খ) মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের অলৌকিকত্ব ও সার্বজনীনতা প্রমান করুন।..... ১৮
১০। ক) মালাইকার (ফেরেশতার) পরিচয় দিন।..... ২০
খ) মালাইকার প্রতি বিশ্বাসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং এদের কর্ম ও দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন। ২১
১১। ক) নবী ও রাসূলের পরিচয় দিন। নবী-রাসুলদের প্রেরণের উদ্দেশ্য কী? ২৪
খ) নবী-রাসুলদের সংখ্যা সম্পর্কে আলোচনা করুন এবং কুরআনের-উল্লেখিত নবী-রাসূলদের নাম লিখুন। ২৬
১২। ক) আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব আলোচনা করুন।..... ২৭
খ) "মানুষ কবর জীবনে শান্তির সম্মুখীন হবে"/ "আখেরাতে বিশ্বাস দুনিয়ার জীবন সুন্দর করার চাবিকাঠি" ব্যাখ্যা করুন।..... ২৮
১৩। ক) কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে? বিস্তারিত লিখুন।..... ২৮
খ) কিয়ামতের আলামত কত প্রকার? সবিস্তার উল্লেখ করুন।..... ২৯
১৪। তাকদীর কী? তাকদীরে বিশ্বাসের বিষয়গুলো কর্ণনা করুন। ৩১
খ) ইসলামী তাকদীরে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও উপকারিতা আলোচনা করুন।..... ৩২
প্রশ্ন-১৫। টীকা: ৩৪

১। ক) ইসলামী আকীদা ও ঈমানের পরিচয় দিন।

➢ **আকীদার আভিধানিক অর্থ:**

আক্বীদা একটি আরবি শব্দ। আরবি عَقْدٌ (আক্বদুন) মূলধাতু থেকে গৃহীত বা উৎপন্ন। এর শাব্দিক অর্থ শক্ত করে গিট দেওয়া, শক্ত করে বাঁধা বা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা। عَقْدٌশব্দটি অন্যান্য অর্থেও ব্যাবহার হয় যেমন, দৃঢ় শপথ, প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি। অতএব কোনকিছুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা বা মানুষ তার অন্তরকে কোনকিছুর সাথে দৃঢ়ভাবে বেঁধে ফেলার নামই আক্বীদা।

`আকীদাহ, পরিভাষাটি সবচেয়ে পরে প্রচলিত হলেও সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করে। ৪র্থ হিজরী শতাব্দীর পূর্বে এ পরিভাষাটির তেমন কোনো প্রচলন দেখতে পাওয়া যায় না। এমনকি ৪র্থ হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত সংকলিত আরবী অভিধান গ্রন্থগুলিতেও `আকীদা, (عَقِيدَة)শব্দটি পাওয়া যায় না। পরবর্তী কালে আকীদা শব্দের ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ করে।

➢ **ইসলামী আক্বীদার সংজ্ঞা:**

ইসলামী পরিভাষায় আকীদা হচ্ছে - ঈমানের ব্যাপারে আল্লাহর সাথে চুক্তি বা অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়া তথা ঈমানের ৭টি মূল স্তম্ভের ব্যাপারে এবং সকল ইমানী দাবীর কর্মপন্থায় অটল থাকা। সংক্ষেপে যা হচ্ছে আল্লাহর উপর এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার প্রতি পরিপূর্ণ ও সন্দেহমুক্ত দৃঢ় বিশ্বাস।

অন্যভাবে বলা যায়, ইসলামী আক্বীদা বলতে বুঝায়, আসমান, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর যিনি সৃষ্টিকর্তা সেই মহান প্রভুর প্রতি সুনিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর উলূহিয়্যাত, রুবূবিয়্যাত ও গুণবাচক নামসমূহকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা।

➢ **ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ:**

আরবী 'আমন' শব্দ থেকে ঈমান শব্দটির উৎপত্তি। أمن অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা, আস্থা, বিশ্বস্ততা, হৃদয়ের স্থিতি ইত্যাদি। ঈমানের আভিধানিক অর্থ হলো- নিরাপত্তা প্রদান, আস্থা স্থাপন, বিশ্বাস ইত্যাদি।
কুরআন কারীমে বলা হয়েছে-

وَقَالَ الذِيْنَ أُوْتوا العلمَ و الإيمانَ

অর্থ: আর যাদেরকে ইলম ও ঈমান দেওয়া হয়েছিল তারা বলবে

- **ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ:**

ইসলামি শরীয়তের পরিভাষায় ঈমানের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমামগণের বিভিন্নধর্মী সংজ্ঞা পরিলক্ষিত হয়। সেগুলো হলো—

(১) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেছেন, `আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতিই হলো ঈমান,।
(২) ইমাম গাজালী (রহ.) বলেছেন, `রাসুল (সা.) -এর আনীত সকল বিধি-বিধানসহ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই হচ্ছে ঈমান,।
(৩) ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) -এর-মতে, `অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং আরকানসমূহ (ইসলামের বিধি-বিধান) কাজে পরিণত করার নাম ঈমান।,

খ) ইসলামী জীবনাদর্শে এর গুরুত্ব মূল্যায়ন করুন।

❖ **ইসলামী জীবনাদর্শে ইসলামী আকীদা ও ঈমানের গুরুত্ব:**

ইসলামের সকল বিধান ও কর্মের মধ্যে যেমন ঈমানের গুরুত্ব বেশি, তেমনিভাবে সকল ইসলামী ইলম বা জ্ঞানের মধ্যে ঈমান বা আকীদা বিষয়ক জ্ঞানের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। মূলত একজন মুমিনের জন্য এ বিষয়গুলি বিষদভাবে অবগত হওয়া তার দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তি ও সফলতার জন্য অপরিহার্য।

➢ **বিশুদ্ধ ঈমানের গুরুত্ব**

মানুষের প্রকৃতি ও মানবজাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, সঠিক বিশ্বাসই মানুষের সকল সফলতা ও সৌভাগ্যের ভিত্তি। বিশ্বাসই মানুষের পরিচালিকা শক্তি। সঠিক বিশ্বাস মানুষকে মানবতার শিখরে তুলে দেয়, তার জীবনে বয়ে আনে অফুরন্ত শান্তি ও আনন্দ। আর ভুল বিশ্বাস বা কুসংস্কার মানুষের মনকে সদাব্যস্ত, অস্থির ও হতাশ করে ফেলে।

আমরা জানি বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয়ে ইসলাম। সঠিক বিশ্বাস বা ঈমান ইসলামের মূল ভিত্তি। আমরা যত ইবাদত বা সৎকর্ম করি সবকিছু আল্লাহর নিকট কবুল বা গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রথম শর্ত বিশুদ্ধ শির্ক-কুফরমুক্ত ঈমান। কুরআন করীমে বিভিন্ন স্থানে একথা বলা হয়েছে। এক স্থানে আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً

''এবং যে ব্যক্তি পরলৌকিক জীবনে কল্যাণ চায়, সে জন্য চেষ্টা করে এবং সে বিশ্বাসী বা মুমিন হয় তাহলে তার চেষ্টা ও কর্ম কবুল করা হবে।''[সূরা বনী ইসরাইল: আয়াত ১৯]

দুনিয়াতে আল্লাহর নিয়ামত ও বরকত অর্জনের এবং আল্লাহর ওয়াদাকৃত পবিত্র জীবন লাভের শর্ত হলো সঠিক ঈমান। আল্লাহ বলেছেন:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

''যদি কোনো পুরুষ বা মহিলা সৎকর্ম করে এবং সে মুমিন হয়, আমি অবশ্যই তাদেরকে (দুনিয়াতে) পবিত্র জীবন দিয়ে জীবিত রাখব এবং (আখিরাতে) তাদের সর্বোত্তম কর্মের উপর ভিত্তি করে তাদের পুরষ্কার দান করব।''[সূরা নাহল: আয়াত ৯৭]

দুনিয়াতে সার্বিক বরকত ও কল্যাণ লাভের জন্য প্রথমত সঠিক ও বিশুদ্ধ ঈমানের অধিকারী হতে হবে। অতঃপর আল্লাহকে ভয় করে সৎ জীবন যাপন করতে হবে। আর কুফরী বা অবিশ্বাসের শাস্তি হলো ধ্বংস ও ক্ষতি।

আল্লাহর বন্ধুত্ব ও সন্তুষ্টি অর্জনের প্রথম ধাপই বিশুদ্ধ ঈমান। আল্লাহ বলেন:

أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

''জেনে রাখ! আল্লাহর ওলীগণের কোনো ভয় নেই এবং তাঁরা চিন্তাগ্রস্তও হবে না- যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়ার পথ অনুসরণ করে।'' [সূরা ইউনুস: আয়াত ৬২-৬৩]

২) ক) তাওহীদ বলতে কী বুঝেন?

➢ **তাওহীদ শব্দের আভিধানিক অর্থ:**

,তাওহীদ, শব্দটি আরবী `ওয়াহাদা (وَحَدَ)ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত, যার অর্থ `এক হওয়া,, `একক হওয়া, বা `অতুলনীয় হওয়া, (to be alone, unique, singular, unmatched, without equal, incomparable)। তাওহীদ অর্থ `এক করা,, `এক বানানো,, `একত্রিত করা,, `একত্বের ঘোষণা দেওয়া, বা `একত্বে বিশ্বাস করা,। প্রচলিত অর্থে তাওহীদ শব্দের অর্থ আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ।

➢ **শারী`য়াতের পরিভাষায় তাওহীদের অর্থ হলো:**

(১) আল্লাহ্‌কে তাঁর সুমহান জাত ও সিফাতে এবং তাঁর অধিকার, কর্ম ও কর্তৃত্বে এক, একক ও অদ্বিতীয় ঘোষণা ও সাব্যস্ত করা এবং এসব ক্ষেত্রে নিজের কথা, কাজ ও বিশ্বাসের দ্বারা আল্লাহ্‌র একত্ব অক্ষুন্ন রাখা।

(২) আল্লাহ তা'আলাকে একমাত্র ইবাদতের যোগ্য একক সত্তা হিসেবে স্বীকার করা ও বিশ্বাস করাই তাওহীদ।

(৩) কিছু উলামায়ে কেরাম বলেন তাওহীদ হলো-

هو إفراد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وفي أسمائه وصفاته

অর্থ: রুবুবিয়্যাত , উলূহিয়্যাত ও নাম ও সিফাতে আল্লাহ তা'য়ালাকে এক বলে মেনে নেওয়া।

(৪) আল্লাহ তায়ালা তাওহীদের পরিচয় দিয়েছেন সূরা ইখলাস নিম্নোক্ত আয়াত দিয়ে-

قوله تعالى: {وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ} [البقرة: ١٦٣]

অর্থ: তোমাদের ইলাহ হলো সেই ইলাহ যিনি এক যাকে ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনিই অতি দয়ালু ও দয়াবান।

খ) মানব জীবনের তাওহীদের গুরুত্ব এবং তা বাস্তবায়নের উপায়-আলোচনা করুন। "তাওহীদুল ইবাদতেই কাফিরদের আপত্তি" প্রমান করুন।

➢ **মানব জীবনে তাওহীদের গুরুত্ব:**

তাওহীদ ইসলামি জীবন ব্যবস্থার মূলভিত্তি। ইসলামি জীবন ব্যবস্থাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করার জন্য এবং তদনুযায়ী জীবন পরিচালিত করার জন্য তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করা অপরিহার্য। রুবুবিয়াত বা বিশ্বসৃষ্টি পরিচালনায়, ইবাদাত ও দাসত্বে এবং গুণাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক ও একক হিসেবে স্বীকার করা অপরিহার্য। রুবুবিয়াত, উলুহিয়াত ও গুণবাচক নামের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করা যাবে না। কেউ আল্লাহকে একক উপাস্য ও প্রতিপালক হিসেবে বিশ্বাস না করলে সে মুমিন হতে পারে না। তাওহীদ ইসলামের প্রবেশদ্বার এবং পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণের সময় একান্তআবশ্যকীয় বিষয়। তাওহীদে অবিশ্বাসী অভিশপ্ত এবং চির জাহান্নামী। তাওহীদ মুসলিম জাতির প্রাণশক্তির উৎস হিসেবে বিবেচিত। জীবনে-মরণে, সুদিনে-দুর্দিনে, একমাত্র বিশ্ব নিয়ন্তা, সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভরতাই তাওহীদের মূলকথা। তাওহীদে বিশ্বাসী মুমিন দ্বিত্ববাদ, বগুত্ববাদ, নাস্তিক্যতাবাদ ও পৌত্তলিকতাবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন থাকে। তাওহীদে বিশ্বাস মুমিন জীবনে অফুরন্তপ্রেরণা এবং আত্মার পরম তৃপ্তি বয়ে আনে। মোটকথা, গোটা ইসলামি ব্যবস্থাপনাই তাওহীদের ধারণা ও বিশ্বাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানব জীবনকে সত্য, সুন্দর ও সুশৃংখল করতে তাওহীদের শিক্ষা অনস্বীকার্য।

❖ **তাওহীদ বাস্তবায়নের উপায়:**

তাওহিদ বাস্তবায়িত হয়, কালিমায়ে শাহাদাতের বাস্তবায়নের মাধ্যমে। আর এই বাস্তবায়নের রয়েছে, দুটি স্তর। ওয়াজিব স্তর এবং মুস্তাহাব স্তর।

➢ **ওয়াজিব স্তর বাস্তবায়িত হয়, চারটি জিনিস বর্জন করার মাধ্যমে।**

১. প্রকাশ্য, আপ্রকাশ্য, ছোট, বড় সব ধরণের শিরক বর্জনের মাধ্যমে।

এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, তার উপর অবশ্যই আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা আগুন। আর জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই। (সূরা মায়েদাহ ৭২)

২. সব ধরণের কুফর বর্জনের মাধ্যমে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى

অনন্তর যে দুর্বৃত্তকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে সে তো ধারণ করল সুদৃঢ় হাতল। (সূরা বাকারা ২৫৬)

৩. সব ধরণের বেদআত বর্জনের মাধ্যমে।

কেননা, বেদআত মূলত শরীয়তের পূর্ণাঙ্গতাকে উপেক্ষা করে। অথচ আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম সম্পূর্ণ করলাম এবং আমার নেয়ামত তোমার উপর পরিপূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের ধর্মরূপে পছন্দ করলাম। (সূরা মাইদা ৩)

৪. গাফলত বর্জনের মাধ্যমে।

কেননা, খালেস দীন তথা তাওহিদ থেকে বিমুখ হওয়ার এক ব্যাপক কারণ হল, গাফলত বা উদাসীনতা। আল্লাহর সাথে সম্পর্কহীনতা ও তাঁর বিধিবিধান সম্পর্কে অবহেলা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

আর ওদের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ ওদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। (সূরা হাশর ১৯)

মুস্তাহাব স্তর: যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বান্দা একজন অপরজনের উপর মর্যাদাবান হয়। তাহল এই যে, অন্তরের দিক থেকে সম্পূর্ণ আল্লাহমুখী থাকা। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো বস্তু বা ব্যক্তি থেকে অন্তরকে এমনভাবে বিমুখ রাখা যে, তার প্রতিটি কথা হবে আল্লাহর জন্য, তার সকল কর্ম হবে আল্লাহর জন্য, এমনকি তার হৃদয়ের স্পন্দনও স্পন্দিত হবে তো আল্লাহর জন্য। এক কথায়, তার হৃদয়ের ভাবনা, মুখের ভাষা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজ-সবই পরিপূর্ণ মাত্রায় আল্লাহর নিরঙ্কুশ আনুগত্য করবে।

- **"তাওহীদুল ইবাদতেই কাফিরদের আপত্তি" প্রমান:**

তাওহীদুল ইবাদতের মাধ্যমেই বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর মধ্যে পার্থক্য নির্ধারিত হয়। যুগে যুগে ঈমান ও কুফরের মধ্যে মূলত এ ব্যাপারেই বিরোধ। প্রথম পর্যায়ের তাওহীদ বা আল্লাহর সৃষ্টি এবং প্রতিপালনের একত্বে অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করেন। এই বিশ্বের একাধিক স্রষ্টা আছেন অথবা এই বিশ্বের কোনো স্রষ্টা নেই- এ ধরণের বিশ্বাস খুবই কম মানুষেই করেছে বা করে। সকল যুগে সকল দেশের প্রায় সব মানুষই মূলত বিশ্বাস করেছেন এবং করেন যে, এই বিশ্বের একজনই স্রষ্টা ও প্রতিপালক রয়েছেন। কিন্তু তারা উপাসনা বা ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁর সাথে ফিরিশতা, নবীগণ, নেককারগণ, জিন্নগণ, অন্যান্য দেবদেবী, পাথর, গাছপালা, মানুষ, মানুষের মুর্তি, স্মৃতিবিজড়িত স্থান, দ্রব্য বা স্মৃতিচিহ্নের পূজা, উপাসনা বা 'ভক্তি' করেছেন।

কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে বিশদভাবে বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আমরা দেখতে পাই যে, যুগে যুগে আল্লাহ যে সকল নবী ও রাসুল প্রেরণ করেছেন তাঁদের উম্মতেরা কখনই বলে নি যে, আল্লাহ ছাড়া এই বিশ্বের কোনো স্রষ্টা বা পালনকর্তা আছেন। বরং তারা সবাই আল্লাহকে একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক, সংহারক বলে বিশ্বাস করতেন। তবে তারা মনে করতেন যে, অনেক দেব-দেবী, গাছ-পাথর, ফিরিশতা, জিন বা মানুষের ঐশ্বরিক শক্তি আছে বা তারা আল্লাহর প্রিয়, কাজেই তাদেরকে উপসনা করলে, তাদের নামে মানত, জবাই বা প্রার্থনা করলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তাই তারা আল্লাহর ইবাদতের সাথে সাথে তাদেরও ইবাদত করতেন। নবী রাসূলগণ তাদেরকে সকল

দেবদেবী পাথর মূর্তি ও মানুষের উপাসনা ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর উপাসনার জন্য আহবান জানান। কাফিরেরা তা মানতে অস্বীকার করে।

মক্কার কাফিররা ইবাদতের তাওহীদে বিশ্বাস করতো না। তারা আল্লাহর ইবাদত করতে অস্বীকার করত না, কিন্তু একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে অস্বীকার করত। কুরআনে কাফিরদের 'দু'আ', মানত, উৎসর্গ ইত্যাদি ইবাদতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলি তারা আল্লাহর জন্য করত। তারা আল্লাহর নামে মানত-কুরবানি করত এবং সাথে সাথে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্যদের জন্যও মানত-কুরবানি করত। ইরশাদ করা হয়েছে:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا

''আল্লাহ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন তন্মধ্যে থেকে তারা আল্লাহর জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, 'এটি আল্লাহর জন্য এবং এটি আমাদের উপাস্যদের জন্য'।''[সূরা আনআম: ১৩৬] কুরআন কারীমের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, মুশরিকদের প্রধান ইবাদত ছিল 'দু'আ' অর্থাৎ ডাকা বা ত্রাণ বা উদ্ধারের জন্য আবেদন বা প্রার্থনা করা। এজন্য কুরআন করীমে এদের শিরককে অধিকাংশ স্থানে 'দু'আ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রায় ৭০ এরও অধিক স্থানে মুশরিকদের শিরককে 'দু'আ' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

কুরআনে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুশরিকগণ মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করত, তাঁকে ডাকত এবং তার কাছে সাহায্য, বিজয় ইত্যাদি প্রার্থনা করত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন তাদেরকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে আহবান করলেন তখন কাফিরগণ আল্লাহর কাছে দু'আ করে বলত,

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

''হে আল্লাহ, যদি (মুহম্মদ (ﷺ) যা প্রচার করছে) তা আপনার পাঠান সঠিক ও সত্য ধর্ম হয়, তবে আপনি আমাদের উপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করুন অথবা আমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দান করুন।''[সূরা আনফাল: ৩২]

বদরের যুদ্ধে যাত্রার আগে মক্কার কাফিরগণ পবিত্র কা'বা গৃহের গিলাফ বা বহিরাবরণী ধরে আল্লাহর কাছে দু'আ করেন এবং বলেন, ''হে আল্লাহ আপনি আমাদের এবং মুহাম্মাদের (ﷺ) দলের মধ্যে যে দল বেশি সম্মানিত ও বেশি ভাল তাদেরকে বিজয়ী করে দেন।'' কাফিরদের নেতা আবু জাহল আল্লাহর কাছে দু'আ করে বলে, ''হে আল্লাহ আমাদের (কাফির ও মুসলিমদের) মধ্য থেকে যারা বেশি পাপী, যারা বেশী আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্টকারী তাদেরকে আপনি এই যুদ্ধে পরাজিত করুন।'' [বুখারী ৪/১৭০৪-১৭০৫]

আল্লাহর কাছে দু'আ করার পাশাপাশি তারা তাদের অন্যান্য উপাস্যের কাছেও দু'আ করত। সাধারণত দু'আ কুবুল হওয়ার আশায় তারা দু'আর পূর্বে মানত, উৎসর্গ, কুরবানী ইত্যাদি পেশ করত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাফিরগণ সাধারণ ও ছোটখাট বিপদ-আপদে আল্লাহকে ডাকত না, বরং এ সকল ক্ষেত্রে তারা তাদের অন্যান্য উপাস্যকে ডাকত এবং তার সাহায্য প্রার্থনা করত। আর কঠিন বিপদে পড়লে তারা আল্লাহকে ডাকত।

৩। ক) ইসলামের মূল ঘোষণা কোনটি? এর কয়টি অংশ রয়েছে?

- **ইসলামের মূল ঘোষণা হলো "কালিমায়ে তায়্যিবাহ"-**

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ

- **কালিমা তাইয়্যিবার দু'টি অংশ রয়েছে।**
  - ✓ **<u>প্রথম অংশ:</u>**

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

অর্থ: নেই কোনো ইলাহ আল্লাহ্ ছাড়া।'

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া কোনো মা'বুদ বা প্রভু নেই, যার গোলামী বা দাসত্ব করা যেতে পারে।

আল্লাহ্ তা'আলাই একমাত্র মা'বুদ, প্রভু ও মালিক এবং ভয় করা ও মেনে চলার যোগ্য। তিনি সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা- আমরা তাঁর সৃষ্টি। তিনি সকলের প্রভু- আমরা তাঁর অধীন দাস। তিনি সারা জাহানের মনিব এবং আমাদেরও মালিক। ভয় একমাত্র তাকেই করতে হবে। তিনিই একমাত্র উপাস্য। আমরা কেবল তাঁরই দাসত্ব স্বীকার করি, কেবল তাঁরই আনুগত্য করি এবং কেবল তাঁরই আইন মেনে চলি।

✓ **দ্বিতীয় অংশ:**

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ الله

অর্থ: মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে তাঁর আদর্শের প্রচারক ও প্রতিষ্ঠাতারূপে মানব জাতির নেতা ও পথ-প্রদর্শকরূপে পাঠিয়েছেন।

আর মুহাম্মাদ (স)-কে আল্লাহর রাসূল বলে এ কথাই ঘোষণা করা হয়েছে যে. তিনি শুধু মুহাম্মাদ (স) নামে একজন মানুষই নন, বরং তিনি আল্লাহ্ রাসূলও বটে এবং এ-ই হলো তাঁর আসল পরিচয়। দ্বিতীয়ত, আল্লাহকে সঠিকভাবে মানতে হলে মুহাম্মাদ (স) নামক রাসূলকেও সঠিকরূপে ও পুরোপুরিভাবে মানতে হবে।

খ) ইসলামের মূল ঘোষণার প্রথম অংশের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।

➢ **কায়িমায়ে তাইয়্যিবার প্রথম অংশ হলো–**

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ

উচ্চারণ: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'

➢ **প্রথম অংশের ব্যাখ্যা:**

এ কালেমার প্রথম অংশকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগ হলো নেতিবাচক, অর্থাৎ কোনো মা'বুদ নেই- প্রভু বা সৃষ্টিকর্তাও কেউ নেই। আমি কাউকেও ভয় করি না, কারো কাছে নতি স্বীকার করি না, কারো আইন মানি না, কারো দয়া-অনুগ্রহ বা সাহায্য আমি চাই না, কাউকেও উচ্চতর ক্ষমতার অধিকারী স্বীকার করি না। কারো ইবাদত-বন্দেগী করি না। এসব দিক দিয়ে যে-কেহ আমার ওপর কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিস্তার করতে চাইলে, আমি তাকেই অস্বীকার করি। সকলের প্রতি আমি বিদ্রোহী। কারো সহিত আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আর দ্বিতীয় অংশ হলো ইতিবাচক; অর্থাৎ এ সব দিক দিয়ে একমাত্র আল্লাহকেই আমি স্বীকার করি ও মানি।

একজন মানুষ যখনই এই কালেমা পড়ে, তখন সে এর মধ্য দিয়ে এ কথাই স্বীকার করে যে, এই দুনিয়া এবং এর সমস্ত জীব-জন্তু ও বস্তু-সামগ্রী- এসবের কোনোটিই সৃষ্টিকর্তা ছাড়া অস্তিত্ব লাভ করতে পারেনি; এর সবই সৃষ্টিকর্তারই সৃষ্টি এবং সে সৃষ্টিকর্তাও বহু নয়, মাত্র একজন। আর সেই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ নয়। কুরআন মজীদেরই সুস্পষ্ট ঘোষণায় বলা হয়েছে:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

অর্থ: তিনিই আল্লাহ্ যিনি আকাশ-রাজ্য ও পৃথিবী এবং এ দু'এর মধ্যে যা কিছু আছে, তা সবই কালের ছয়টি ভাগে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা সাজদাহ্ : ৪)

وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ ، لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ.

অর্থ: তোমাদের মা'বুদ– তিনি একমাত্র মা'বুদ; তিনি ছাড়া আর কেউ মা'বুদ নেই– তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। (সূরা বাকারা: ১৬৩)

আল্লাহ্ তা'আলা সারা জাহানকে শুধু সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেন নি বরং একে রীতিমতো পরিচালনা করা, প্রাণশক্তি ও দরকারী খাদ্য দিয়ে একে এবং এর সমস্ত জীব-জন্তুকে বাঁচিয়ে রাখা ও লালন-পালন করা প্রভৃতি কাজও করেন। এ সব ব্যাপারেও তাঁর কেউ শরীক নেই- কেউ সাহায্যকারীও নেই। আল্লাহ্ তা'আলা সারা জাহানের অধিবাসীদের পালনকর্তা, মালিক ও প্রভু । আসমান ও জমিন এবং এর মধ্যকার সব জিনিসের, সব বিত্ত-সম্পত্তি ও ধন-দৌলতের একমাত্র মালিক তিনিই।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কাররূপে প্রমাণ হয়ে গেল যে, সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা আছেন এবং তিনি আল্লাহ্ তা'আলা ভিন্ন আর কেউ নয়। তিনি এক ও একক; সারা জাহানের পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, রিযিকদাতা ও প্রভু একমাত্র তিনিই। অতএব সেই এক আল্লাহ্রই দাসত্ব কবুল করা, কেবল তাঁকেই মা'বুদ ও প্রভু বলে স্বীকার করা এবং অন্য কারো মধ্যে এসব গুণ আছে বলে মনে না করা সমস্ত মানুষের কর্তব্য।

৪। ক) ইলাহ-এর পরিচয় দিন।

ইলাহ হলেন যার মধ্যে সমস্ত পূর্ণাঙ্গ গুণাবলী ও মহান আল্লাহর সমস্ত বৈশিষ্ট্য একত্রিত হয়েছে। এ নামের মধ্যে আসমাউল হুসনার সমস্ত নাম সন্নিবেশিত হয়েছে। এ কারণেই এ কথা বলা বিশুদ্ধ যে, আল্লাহই মূলত ইলাহ। কেননা আল্লাহ এমন এক নাম যার মধ্যে সমস্ত আসমাউল হুসনা তথা আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহ ও সুউচ্চ গুণাবলীসমূহ একত্রিত হয়েছে।

আল্লাহর এ নামের দলীল হলো তাঁর নিম্নোক্ত বাণী,

إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۘ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا

অর্থ: "আল্লাহই কেবল এক ইলাহ, তিনি পবিত্র মহান এ থেকে যে, তাঁর কোন সন্তান হবে। আসমানসমূহে যা রয়েছে এবং যা রয়েছে জমিনে, তা আল্লাহরই। আর কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৭১]

আল্লাহ তথা প্রকৃত 'ইলাহ' জীবনদাতা মৃত্যুদাতা। তিনি সমস্ত জীবকে লালন-পালন ও রিযিক দান করেন। তিনিই প্রার্থনা শ্রবণকারী ও শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনকারী। নষ্ট ও ক্ষয়প্রাপ্ত জিনিসকে তিনিই আবার নতুন করে গড়তে পারেন। প্রাকৃতিক জগতে একমাত্র তাঁরই হুকুম ও আইন চলে। তিনিই সকল কাজের মূল কর্তা। তাঁরই ওপর একান্তরূপে ভরসা করতে হয়। তিনিই নিরাশার আশা; বিপদে-আপদে সব সময় কেবল তাঁরই রহমতের আশা করা যায়। মানুষের লাভ-লোকসান, ক্ষতি-উপকার কেবল তাঁরই ইচ্ছাক্রমে হয়ে থাকে। দৃশ্য-অদৃশ্য, জানা-অজানা সব কিছুই তিনি ভালো করে জানেন। তিনি সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী এবং সকলের ওপর জয়ী। তিনি সব রকম শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্বের একমাত্র মালিক। তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবন পরিচালনার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান দিয়েছেন। অতএব মানুষের কর্মজীবনে তাঁর আদেশ-নির্দেশই একমাত্র পালনযোগ্য আইন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সব ব্যাপারে কেবল তাঁরই আদেশ ও নিষেধ মাথা নত করে মানতে এবং পালন করে চলতে হবে। তাঁর কোনো ক্ষয়-ক্ষতি নেই; তিনি অবিনশ্বর, অক্ষয় ও চিরঞ্জীব।

খ) ইলাহ সম্পর্কে জাহেলী মতবাদ বিস্তারিত লিখুন।

ইলাহ সম্পর্কে জাহিলী নিজস্ব চিন্তাধারা ও মতবাদ ছিল। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

- **মুশরিকগণ একমাত্র সাহায্যদাতা আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে গিয়ে অন্য শক্তির কাছে সাহায্য ভিক্ষা করে:**

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ

অর্থ: আল্লাহকে ছেড়ে তারা অন্য শক্তিকে 'ইলাহ' বানিয়ে নিয়েছে এ আশায় যে, সম্ভবত তার কাছে থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে। (সূরা ইয়াসীন : ৭৪)

- **কার্যসিদ্ধির জন্য তারা মৃত মানুষকে ডাকে:**

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ، وَمَا يَشْعُرُونَ ، أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত তারা আর যাদের (প্রভু মনে করে) ইবাদত করে, তারা একটি জিনিসও সৃষ্টি করতে পারে না; বরং তাদেরকেই আর একজন সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেছেন। তারা মৃত জীবিত নয়। তারা এতটুকুও জানে না যে, তাদের কোন দিন কোন সময় পুনরুজ্জীবিত করা হবে। (সূরা নহল: ২০-২১)

- **তারা আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভ করার উদ্দেশ্যে তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য শক্তির দাসত্ব করে:**

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

অর্থ: যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য শক্তিকে মনিব ও পৃষ্ঠপোষক হিসাবে গ্রহণ করে এবং বলে, আমরা কেবল এ উদ্দেশ্যে তাদের ইবাদত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে। অর্থাৎ তারা প্রকৃত আল্লাহর কাছে পৌঁছার জন্য কৃত্রিম আল্লাহ্ বানিয়ে লয়। (সূরা যুমার ৪৩)

- **মুশরিকরা আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার জন্য অন্য শক্তির ইবাদত করে:**

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللهِ

অর্থ: তারা আল্লাহ্ ছাড়া এমন সব জিনিসের উপাসনা করে, তাদের উপকার বা ক্ষতি করবার কোনো ক্ষমতাই যেসবের নেই। তারা বলে যে, এরা আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। (সূরা ইউনুস ৪ ১৮)

এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তাদের ধারণা হলো, সরাসরিভাবে আল্লাহর কাছে পৌছা যাবে না। আল্লাহর কাছে পৌঁছতে হলে কৃত্রিম উপাস্যদেরকে মাধ্যম ধরতে হবে।

- **মুশরিকরা চন্দ্র এবং সূর্য্যের পূজা করে:**

মুশরিকরা মনে করে, দিন-রাত, চন্দ্র ও সূর্য বিস্ময়কর জিনিস, এরা উপাস্য না হয়ে পারে না। অথচ চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহই সৃষ্ট এবং তাঁর অস্তিত্ব এবং একত্বের নির্দশন মাত্র। আল্লাহ বলছেন-

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

অর্থ: রাত ও দিন, চন্দ্র এবং সূর্য আল্লাহর অস্তিত্ব এবং একত্বের নিদর্শন; অতএব কি চন্দ্র কি সূর্য- এর কোনোটিকেই সিজদা (পূজা-উপাসনা) করিও না; কেননা এগুলোতো প্রকৃত আল্লাহর অস্তিত্ব ও অসীম কুদরতের প্রমাণ। এগুলোকে সিজদা করে তো কিছুই লাভ হবে না। (সূরা হা-মীম আস সিজদাহঃ ৩৭)

- **মুশরিকরা আলেম, পীর ও পণ্ডিতদের দাসত্ব করে:**

মুশরিকরা আলেম, পীর ও পণ্ডিতদের দাসত্ব করে; তারা যাই বলে ন্যায়-অন্যায় বিচার না করে তারা তাই পালন করে। অন্ধভাবে এরূপ কোনো মানুষের আনুগত্য করা ও নির্বিচারে হুকুম পালন করে চলা শিরক। কারণ মানুষ আল্লাহ ছাড়া আর কারো হুকুম নির্বিচারে পালন করলে তাকেই আল্লাহর মর্যাদা দান করা হয়। আল্লাহ তাদের অবস্থা বর্ণনা করছেনঃ

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

অর্থ: তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে বাদ দিয়ে তাদের আলেম, পীর, পণ্ডিত ও সরদার লোকদেরকে নিজেদের 'বন্ধু' বা প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। (সূরা তওবা: ৩১)

- **বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কিংবা প্রয়োজন মিটাবার জন্য তারা মানুষকে ডাকে।**

এরূপ ডাকা আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ এবং এও শিবৃক্কের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এরূপ উদ্দেশ্যে ডাকতে হবে কেবলমাত্র আল্লাহকে। কুরআনে বলা হয়েছে-

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

অর্থ: আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদেরকে (বিপদ মুক্তির জন্য) ডাকো তারা তোমাদেরই মতো (অক্ষম) বান্দাহ বই তো নয়। অতএব, (তারা সত্যই তোমাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে বলে মনে করে থাকো, তবে) তাদের কাছে দো'আ করেই দেখো, তারা তোমাদের প্রার্থনার জবাব দান করুক না, তাদের সম্পর্কে তোমাদের ধারণা যদি সত্যই হয়। (আ'রাফ। ১৯৪)

- **তারা এক আল্লাহ তা'আলার বিধান ত্যাগ করে মনের ইচ্ছামতো কাজ করে- ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ এবং পাপ-পূণ্য কিছুরই বিচার করে না।**

اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

অর্থ: যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির কামনাকে 'প্রভু' বানিয়ে লয় (কেবল প্রবৃত্তির ইচ্ছামতো কাজ করে) তার অবস্থা কি তুমি দেখোনা? তথাপি কি তার দায়িত্ব তুমি গ্রহণ করবে? (সূরা আল-ফুরকান: ৪৩)

এখানে যে আলোচনা করা হলো, একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে খুব সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, দুনিয়ার একদল মানুষ এক আল্লাহকে 'ইলাহ' ও 'রব্ব' অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক স্বীকার না করে, নিজের প্রবৃত্তির কামনা, ক্ষমতাবান মানুষ, বাতিলপন্থী পীর-দরবেশ ও ধর্মগুরু, চন্দ্র-সূর্য এবং নিষ্প্রাণ দেব-দেবীকে বাস্তবিকই 'খোদা' বা 'প্রভু' বানিয়ে নিয়েছে আর তাদের দাসত্ব, গোলামী, পূজা-উপাসনা ও হুকুম বরদারী করছে। কিন্তু সারে জাহানের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক এক আল্লাহ্র অস্তিত্ব গুণ-বৈশিষ্ট্যকে তারা কেউই সম্পূর্ণ অস্বীকার করেনি; কেউই কখনো এ কথা বলেনি যে, সৃষ্টিকর্তা নেই বা তার কোনো গুণ-বৈশিষ্ট্য নেই। আসলে তারা আল্লাহকেই সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিমান ও সর্বপ্রধান হুকুমদাতা বলে মানত, কিন্তু তাদের আকীদার মধ্যে মূল দোষ ছিল এই যে, তারা সেই সঙ্গে আল্লাহ্র সৃষ্ট জীবদের মধ্যে ফেরেশতা, জ্বিন, মানুষ, দেব-দেবী, চন্দ্র-সূর্য-তারকা ইত্যাদিকেও আল্লাহ্ তা'আলার অংশীদার, সাহায্যকারী বা অনুরূপ শক্তির আধার বলে মানতো। বিপদের সময় এদের কাছে আশ্রয় চাইত; কঠিন কোনো কাজ সমাধা করার জন্য এদের কাছে শক্তি প্রার্থনা করত। মনে করত যে, এদেরও কিছু না কিছু ক্ষমতা আছে। প্রকৃত আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার জন্য প্রকৃত আল্লাহ্ ক্ষমা ও রহমত পাওয়ার জন্য এবং প্রকৃত আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করাইবার জন্য তারা এসবের দাসত্ব ও পূজা করত।

প্রশ্ন-৫। কালিমায়ে তাইয়্যেবার শিক্ষা বিস্তারিত লিখুন।

- **<u>কালিমায়ে তাইয়্যেবার পরিচয়:</u>**

কালেমা তাইয়্যেবা হচ্ছে-

لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.)"

অর্থ "আল্লাহ্ ব্যাতীত কোন প্রকৃত ইলাহ (উপাস্য) নেই এবং হযরত মোহাম্মাদ (সা.) তার প্রেরিত রাসুল"

কালেমা তাইয়্যেবার অংশ দু'টো অংশ রয়েছে। আর তা হলো,

প্রথম অংশ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, যার অর্থ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই তিনিই একমাত্র পালনকর্তা, মাবুদ, প্রভু, মালিক, তিনি সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা আমরা সবাই তাঁরই সৃষ্টি, তিনি সকলের প্রভু, আমরা সবাই তাঁর দাস/গোলাম। তিনিই আমাদের একমাত্র উপাস্য, আমরা তাঁরই দাসত্ব স্বীকার করে, কেবল তাঁরই আনুগত্য করি এবং তাঁরই আইন মেনে চলার চেষ্টা করি।

দ্বিতীয় অংশ: মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ অর্থ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে তাঁর আদর্শ প্রচারের জন্য দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। এই কালেমা যেহেতু ইসলামের মূল ভিত্তি/বুনিয়াদ, এর

উপর ইসলামের অন্যসব হুকুম-আহকাম ইমারত স্বরূপ দাঁড়ানো আছে। এই কালেমার মধ্যে মহান আল্লাহতায়ালার যে পরিচয় দেয়া হয়েছে তাই আল্লাহর সঠিক পরিচয়। আর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কেবল মাত্র একজন মানুষই নয়, বরং তিনি আল্লাহর রাসূলও বটে, আর এটা তাঁর আসল পরিচয়। আর আল্লাহকে ভালবাসতে হলে প্রথমেই তাঁর বন্ধু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে ভালবাসতে হবে।

➢ **কালেমা তাইয়্যেবার শিক্ষা:**

কালেমা তাইয়্যেবা একটি বিরাট বিপ্লবী ঘোষণা। যারা এই কালেমা গ্রহণ করে, তারা একমাত্র আল্লাহর উপসনা ও তারই দাসত্ব স্বীকার করে।

যেমন- আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আর তার নৈকট্য লাভের উপায় তালাশ কর এবং আল্লাহর পথে জিহাদ কর, আশা করা যায় যে, তোমরা সফলকাম হবে।' (সূরা মায়িদাহ, আয়াত-৩৫)

বস্তুত এই কালেমা তাইয়্যেবার প্রতি যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তারা ইসলামী বিধান ব্যতীত অন্য কোন ইজম স্বীকার করতে পারে না। আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারো সার্বভৌমত্ব মানতে পারে না। ইসলামী রাষ্ট্রে ও মুসলিম দেশে মানব রচিত কোন আইন চলতে পারে না। তাই যে কোন ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলাম ও কুরআন বিরোধী যে কোন নেতা/রাজশক্তির স্বরচিত আইন চলতে পারে না।

এটি এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বাণী যা মুসলমানগণ তাদের আজান, ইকামাত, বক্তৃতা-বিবৃতিতে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করে থাকে। এটি এমন এক কালেমা যার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আসমান-জমিন, সৃষ্টি হয়েছে সমস্ত মাখলুকাত। আর এর প্রচারের জন্য আল্লাহ যুগে যুগে পাঠিয়েছেন অসংখ্য রাসূল এবং নাজিল করেছেন আসমানি কিতাবসমূহ, প্রণয়ন করেছেন অসংখ্য বিধান। প্রতিষ্ঠিত করেছেন তুলাদন্ড (মিযান) এবং ব্যবস্থা করেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাবের, তৈরি করেছেন জান্নাত এবং জাহান্নাম। এই কালেমাকে স্বীকার করা এবং অস্বীকার করার মাধ্যমে মানব সম্প্রদায় ঈমানদার এবং কাফির এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। অতএব সৃষ্টি জগতে মানুষের কর্ম, কর্মের ফলাফল, পুরস্কার অথবা শাস্তি সব কিছুরই উৎস হচ্ছে এই কালেমা। এরই জন্য উৎপত্তি হয়েছে সৃষ্টিকুলের, এ সত্যের ভিত্তিতেই পরকালীন জিজ্ঞাসাবাদ এবং এর ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হবে সওয়াব ও শাস্তি। এই কালেমার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মুসলমানদের কেবলা এবং এ হলো মুসলমানদের জাতি সত্তার ভিত্তি-প্রস্তর এবং এর প্রতিষ্ঠার জন্য খাপ থেকে খোলা হয়েছে জিহাদের তরবারি। বান্দার উপর এটাই হচ্ছে আল্লাহর অধিকার, এটাই ইসলামের মূল বক্তব্য ও শান্তির আবাসের (জান্নাতের) চাবিকাঠি এবং পূর্বাপর সকলই জিজ্ঞাসিত হবে এই কালেমা সম্পর্কে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কার ইবাদত করেছ? নবিদের ডাকে কতটুকু সাড়া দিয়েছ? এই দুই প্রশ্নের উত্তর দেয়া ব্যতীত কোন ব্যক্তি তার দুটো পা সামান্যতম নাড়াতে পারবে না। আর প্রথম প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -কে ভালো ভাবে জেনে-বুঝে এর স্বীকৃতি দান করা এবং এর দাবি অনুযায়ী কাজ করা। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর সঠিক হবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসাবে মেনে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার মাধ্যমে। আর এ কালেমাই হচ্ছে কুফর ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী। এ হচ্ছে আল্লাহ ভীতির কালেমা ও মজবুত হাতল।

এজন্যই বান্দার প্রথম কাজ হলো এ কালেমার স্বীকৃতি দান করা; কেননা এ হলো সমস্ত কর্মের মূল ভিত্তি।

প্রশ্ন-৬: ক) শিরক-এর পরিচয় দিন এবং এর প্রকারভেদ আলোচনা করুন।

➢ **শিরক-এর আভিধানিক অর্থ:**

আরবীতে শির্ক (شِرْك) অর্থ অংশীদার হওয়া (to share, participate, be partner, associate)। ইশরাক (إشراك) ও তাশ্রীক (تَشْرِيك) অর্থ অংশীদার করা বা বানানো। সাধারণভাবে 'শির্ক' শব্দটিকেও আরবীতে 'অংশীদার করা' বা 'সহযোগী বানানো' অর্থে ব্যবহার করা হয়।

➢ **পরিভাষায় শিরক:**

ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর কোনো বিষয়ে আল্লার সমকক্ষ মনে করা বা আল্লাহর প্রাপ্য কোনো ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য পালন করা বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকাকে শিরক বলা হয়। এক কথায় 'আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট কোনো বিষয় অন্য কাউকে অংশী বানানোই শিরক।

কুরআনের ভাষায় শিরক হলো কাউকে 'আল্লাহর সমতূল্য' করা। মহান আল্লাহ বলেন:

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"অতএব তোমরা জেনেশুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাবে না।" [সূরা বাকারা: আয়াত-২২]

➢ **শিরকের প্রকারভেদ:**

শিরক প্রথমত দুই প্রকার:

(১) শিরকে আকবার (২) শিরকে আসগার

➢ **শিরক আকবারের প্রকারভেদ:**

তাওহীদের তিনটি পর্যায় রয়েছে। তাওহীদের বিপরীতই শিরক। এজন্য শিরককেও তিনভাগে ভাগ করা হয়:

❖ **প্রতিপালনের শিরক্** (الشرك في الربوبية)

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সৃষ্টি বা প্রতিপালনের বিষয়ে আল্লাহর সাথে শরীক করা। যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো মধ্যে সৃষ্টি, সংহার, প্রতিপালন, রিযক দান, জীবন দান, মৃত্যু দান, বিশ্ব পরিচালনা, মঙ্গল-অমঙ্গল ইত্যাদি ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা। এখানে উল্লেখ্য যে, মহান আল্লার রুবূবিয়্যাত বা রুবূবিয়্যাতের কোনো বিষয় অস্বীকার করাও এ পর্যায়ের শিরক। কারণ এরূপ বিশ্বাস পোষণকারী প্রকৃতি বা অন্য কোনো জাগতিক শক্তিকে রুবূবিয়্যাতের ক্ষমতাসম্পন্ন বলে বিশ্বাস করে।

❖ **নাম ও গুণাবলির শিরক (الشرك في الأسماء والصفات)**

আমরা দেখেছি যে, মহান আল্লাহর পূর্ণতার গুণাবলি ও মহাসম্মানিত পবিত্র নামসমূহ রয়েছে। এসকল গুণ বা নামের ক্ষেত্রে কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা এ পর্যায়ের শিরক। মহান আল্লাহকে কোনোভাবে মানুষ বা সৃষ্টির সাথে তুলনা করা অথবা মানুষ বা অন্য কোনো সৃষ্টিকে কোনোভাবে মহান আল্লাহর সাথে তুলনীয় মনে করা এ পর্যায়ের শিরক।

❖ **ইবাদতের শিরক (الشرك في الألوهية)**

'ইবাদত'-এর ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বলে বিশ্বাস করা বা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ইবাদত করাকে 'ইবাদতের শির্ক' বলা হয়। ইবাদতের অর্থ আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, ইবাদত অর্থ প্রগাঢ় ভয় ও আশা-মিশ্রিত চূড়ান্ত ভক্তি-বিনয় ও অসহায়তব প্রকাশ। মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি এরূপ অলৌকিক ভক্তি ও অসহায়ত্ব প্রকাশই ইবাদতের শিরক।

➢ **শিরক আস্গার (الشرك الأصغر)**

যে বিশ্বাস, কথা বা কর্ম শিরকের মত হলেও প্রকৃত শিরকের পর্যায়ে পৌঁছে নি তাকে শিরক আসগার বলা হয়। যেমন আল্লাহর ইবাদত করার ক্ষেত্রে মানুষদের থেকে প্রশংসা, সুনাম বা জাগতিক কোনো কিছু আশা করা, অথবা এমন কথা বলা যাতে বাহ্যত আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর সাথে তুলনীয় বলে মনে হতে পারে, যদিও বক্তার উদ্দেশ্য তা নয়।

আমরা দেখেছি যে, প্রকৃত শির্ক হলো আল্লাহ ছাড়া কাউকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার বা আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক থাকার যুক্তিতে বা অন্য কোনো যুক্তিতে বিশ্ব পরিচালনায় কিছু অধিকার এবং ইবাদত লাভের অধিকার আছে বলে বিশ্বাস করা, এবং তার নিকট থেকে অলৌকিক সাহায্য, দয়া, বর, আশীর্বাদ বা নেকদৃষ্টি লাভের জন্য বা তার অলৌকিক ক্রোধ, অভিশাপ বা বিরক্তি থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য তার নিকট চূড়ান্ত বা অলৌকিক ভক্তি ও বিনয় প্রকাশ করা। পক্ষান্তরে শির্ক আসগারের ক্ষেত্রে ইবাদতকারী কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ, রুবূবিয়্যাত বা উলূহিয়্যাতের অধিকারী বলে বিশ্বাস করে না, তবে তার কর্ম ও কথা এরূপ বিশ্বাসের কাছাকাছি চলে যায়। যে কোনো শিরক আসগর শিরক আকবরে পরিণত হতে পারে। কারণ মূল বিষয়টি নির্ভর করে উদ্দেশ্য ও বিশ্বাসের উপরে। শিরক আসগারের বিভিন্ন প্রকার আলোচনা করলে উভয় পর্যায়ের শিরকের মধ্যে পার্থক্য আরো সুস্পষ্ট হবে।

খ) 'শিরক ও বর্তমান মুসলমান' একটি পর্যালোচনা উপস্থাপন করুন।

৭। ক) রিসালতের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করুন।

রিসালাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বার্তা, চিঠি , পয়গম, সংবাদ বা কোন ভাল কাজের দায়িত্ব বহন করে অন্য কারো কাছে পৌঁছানো। ইসলামী শরীয়তে রিসালাত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ইসলামী পরিভাষায় রিসালাত অর্থ হলো আল্লাহ্ তাআলার বার্তা বা ঘোষণা বা আদেশ, নির্দেশ, নিষেধ সমূহ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। সৃষ্টির পরবর্তী থেকে মানুষকে সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ্ যুগ যুগ ধরে পৃথিবীতে নবী রাসুল আঃ পাঠিয়েছেন। এইসব নবী রাসুল আঃ গণ মানুষকে আল্লাহর পরিচয় দিতো। তাওহীদের বাণী প্রচার করতো। এই তাওহীদের বাণী প্রচারের কাজই হচ্ছে রিসালাত।

- **<u>রিসালাতের প্রয়োজনীয়তা:</u>**

নবি-রাসূলগণ মানব জাতির জন্য অনুসরণিয় আদর্শ। মানুষ যখন শয়তানের প্ররোচনায় সত্য পথ থেকে দূরে সরে গিয়ে সৃষ্ট বস্তুর বা প্রাণির ইবাদতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, আলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শিরক ও কুফরের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে তখনি আল্লাহ তায়ালা নবি-রাসূল পাঠিয়েছেন। মানুষের কিসে কল্যাণ হয়, কিসে অকল্যাণ হয়, সে বিষয়ে ওহির শিক্ষা ছাড়া মানুষ সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সক্ষম নয়। নবি-রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা সে ব্যবস্থাটি করেছেন। নবি-রাসূলগণ জীবনের প্রতিটি কাজ কীভাবে হবে তা তারা অত্যন্ত আন্তরিকতা ও সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে মানব জাতিকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ

যেমন আমি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য একজন রাসূল পাঠিয়েছি। তিনি তোমাদের সম্মুখে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তোমাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করেন এবং তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। আর তোমাদেরকে সে বিষয়েই শিক্ষা দেন যা তোমরা জানতে না।" (সুরা বাকারা:১৫১)
মহানবি (স) এ প্রসঙ্গে বলেন-

إِنَّما بُعِثْتُ مُعَلِّمًا

'আমাকে শিক্ষকরূপে' প্রেরণ করা হয়েছে। (ইবনু মাজাহ: ২২৯)

নবি-রাসূলগণ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের ধারক বাহক হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ নিজেই এই বাহন ও মাধ্যমরূপে নবিরাসূল প্রেরণের ব্যবস্থা করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۭ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ۭ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ

“হে রাসূল! আপনার নিকট আপনার রবের পক্ষ থেকে যা কিছু নাযিল হয়েছে তা আপনি যথাযথভাবে প্রচার করুন। যদি তা না করেন, তা হলে আপনি তাঁর বার্তা প্রচার করলেন না।” (সুরা আল-মায়িদা:৬৭)

মানবরচিত আইন দূরদর্শী নয়। তাই, আল্লাহর দূরদর্শী আইন মানব সমাজে প্রয়োগ, প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন নবি রাসূলগণের অন্যতম কাজ। মানব সমাজের সংস্কার করার লক্ষ্যে নবি-রাসূলগণ কাজ করেছেন। তাই নবি-রাসূলগণের প্রধান দায়িত্ব হলো আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার সমাজের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করা। নবি-রাসূল প্রেরণের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর মনোনিত দ্বীন, জীবন বিধানকে অন্য সকল ধর্ম, মতাদর্শ ও মতবাদের উপর প্রাধান্য, বিজয়ী ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন “তিনিই স্বীয় রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন যেন তিনি এ দীনকে অন্যসব দীনের উপর বিজয়ী করেন।” (সুরা আত-তাওবাহ ৯:৩৩)

মানুষ যাতে আল্লাহ্‌কে ভুলে না যায়। তাঁর পরিবর্তে অন্য কাউকে উপাস্য গ্রহণ না করে বা তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরিক না করে তার জন্য যুগে যুগে আল্লাহর বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে নবী রাসুলদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।

যদি আল্লাহ্ নবী রাসুল প্রেরণ না করতেন তাহলে পৃথিবীতে কেউ আল্লাহ্‌কে চিনতে এবং জানতে পারতো না। সেইসাথে আল্লাহর কোনো বান্দা তাঁর ইবাদত বন্দেগীও করতো না।

সুতরাং আল্লাহ্‌কে চেনার জন্য জানার জন্য এবং ইবাদত করার জন্য নবী রাসুল গণের রিসালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। নবী রাসুলগণ রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন বলেই আমরা আজ আল্লাহ্‌কে চিনতে এবং জানতে পেরেছি।

খ) মহানবী (সাঃ) এর খাতমে নবুওয়াত কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রমান করুন এবং এতে বিশ্বাসের আবশ্যকতা বর্ণনা করুন।

মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল, তাঁর পরে আর কোনো ওহী নাযিল হবে না এবং কোনো নবী বা রাসূল আসবেন না। বস্তুত, কুরআন ও হাদীসের এ বিষয়ক কোনো ঘোষণা না থাকলেও কয়েকটি কারণে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে শেষ নবী হিসেবে বিশ্বাস করতে আমরা বাধ্য হতাম।

প্রথমত, সকল নবীই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন তাঁর পরে অন্য নবী, রাসূল বা বার্তাবাহক আগমন করবেন, যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে বাণী গ্রহণ করে মানুষদেরকে জানাবেন। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাদীস শরীফে কখনো কোনোভাবে জানান নি যে, তাঁর পরে মানব জাতির মধ্যে কোনো নবী, রাসূল বা বার্তাবাহক আসবেন। এ বিষয়টিই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, তাঁর পরে কোনো নবী আসবে না।

দ্বিতীয়ত, পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের দাওয়াত ছিল সাময়িক এবং নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য। এজন্য তাঁদের প্রতি প্রেরিত ওহী চূড়ান্তভাবে সংরক্ষিত হতো না। কাজেই তাঁদের পরে নতুন নবীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত। মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর দীনের সর্বজনীনতা ও পরিপূর্ণতার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে কুরআন ও হাদীসে বারংবার এবং তাঁর দীনকে পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। কাজেই এরপর আর কোনো নতুন নবীর আগমন নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু বিষয়টি এখানেই শেষ হয় নি। উপরন্তু কুরআন কারীমে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) শেষ নবী। অসংখ্য হাদীসে এ বিষয়ে বারংবার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

‘‘মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।’’[সূরা আহযাব: ৪৫-৪৬]

মুতাওয়াতির পর্যায়ে বর্ণিত অর্ধশতাধিক সহীহ হাদীসে খাতমুন নুবুওয়াত বা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাধ্যমে নুবুওয়াতের পরিসমাপ্তির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। উপরে উল্লিখিত হাদীসে আমরা দেখেছি যে, আবূ হুরাইরা (রা) বলেছেন,

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: ''ছয়টি বিষয়ের মাধ্যমে আমাকে নবীগণের (সকল নবীর) উপরে মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে: ... (৬) আমার দ্বারা নবীগণ সমাপ্ত হয়েছেন।''

অন্য হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ.

''ইস্রায়েল সন্তানগণকে (বনী ইসরাঈলকে) শাসন করতেন নবীগণ। যখনই কোনো নবী মৃত্যুবরণ করতেন তখন অন্য একজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। আর আমার পরে কোনো নবী নেই, কিন্তু খলীফাগণ থাকবেন এবং তারা সংখ্যায় অনেক হবেন। উপস্থিত সাহাবীগণ বলেন: আপনি আমাদেরকে তাদের বিষয়ে কি নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলেন: ধারাবাহিকভাবে প্রথম ব্যক্তির পরে পরবর্তী ব্যক্তি এভাবে তাদের বাইয়াত বা আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবে এবং তাদেরকে তাদের প্রাপ্য (আনুগত্য) প্রদান করবে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের অধীনস্থ জনগণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।''[সহীহ বুখারী-৩৪৫৫]

সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আলীকে (রা) বলেন:

أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي

''মূসার সাথে হারূনের মর্যাদা যেরূপ ছিল আমার সাথে তোমার মর্যাদা সেরূপ, ব্যতিক্রম এই যে, আমার পরে কোনো নবী নেই।''[সহীহ মুসলিম: ২৪০৪]

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

مَثَلِي وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ

''আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের উদাহরণ এক ব্যক্তির মত যিনি একটি খুবই সুন্দর ও মনোরম ইমারত তৈরী করেছে, কিন্তু ইমারতের এক দিকে একটি ইটের জায়গা খালি রেখেছেন। মানুষেরা আশ্চর্য হয়ে এই মনোরম ইমরতটির চারিদিকে ঘুরতে থাকে এবং বলতে থাকে: এ ইটটি যদি স্থাপন করা হতো! তিনি বলেন: আমিই এই সর্বশেষ ইট, আমিই সর্বশেষ নবী।''[সহীহ মুসলিম ২২৮৬]

অন্য হাদীসে জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

مَثَلِي وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَتَمَّهَا وَأَكْمَلَهَا إِلا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا وَيَقُولُونَ لَوْلا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ جِئْتُ فَخَتَمْتُ الأَنْبِيَاءَ

''আমার ও অন্যান্য সকল নবীর উদাহরণ একজন ব্যক্তির ন্যায়, যিনি একটি বাড়ি তৈরি করেছেন এবং তাকে পূর্ণতা দান করেছেন, কিন্তু একটি ইটের স্থান অপূর্ণ রেখেছেন। মানুষেরা এ বাড়িতে প্রবেশ করতে লাগল এবং অবাক হতে লাগল। তারা বলতে লাগল, এই ইটের স্থানটি যদি অপূর্ণ না থাকত! রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আমিই সেই ইটের স্থান, আমি এসে নবীগণের সমাপ্তি টেনেছি।''[সহীহ মুসলিম ২২৮৭]

অন্য হাদীসে জুবাইর ইবনু মুতয়িম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

إِنَّ لِي أَسْمَاءً أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ (نَبِيٌّ)

‘‘আমার অনেক নাম আছে। আমি মুহাম্মাদ, এবং আমি আহমদ, এবং আমি ‘মাহী’ (উচ্ছেদকারী), আমার মাধ্যমে আল্লাহ কুফ্র উচ্ছেদ করবেন, এবং আমি ‘হাশির’ (একত্রিতকারী), আমার পদদ্বয়ের নিকটেই মানুষেরা কিয়ামতের দিন একত্রিত হবে, এবং আমি ‘আকিব’ (সর্বশেষ), যার পরে আর কোনো নবী নেই।’’[সহীহ বুখারী: ৪৮৯৬]

অন্য হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ فَلا رَسُولَ بَعْدِي وَلا نَبِيَّ

‘‘রিসালাত বা রাসূলের পদ এবং নুবুওয়াত বা নবীর পদ শেষ হয়ে গিয়েছে, কাজেই আমার পরে কোনো রাসূল নেই এবং কোনো নবীও নেই।’’[তিরমিযী: ২২৭২]

গবেষকগণ উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাধ্যমে নুবুওয়াতের সমাপ্তির বিষয়ে ৩৭ জন সাহাবী থেকে সহীহ সনদে ৬৫টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[১৭] এভাবে আমরা দেখছি যে, কুরআন কারীমের সুস্পষ্ট নির্দেশনার পাশাপাশি মুতাওয়াতির হাদীসের মাধ্যমে বিষয়টি সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। বরং প্রকৃত বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নবুয়ত ও খাতমুন-নুবুওয়াত একইভাবে বর্ণিত ও প্রমাণিত। যারা তাঁর নুবুওয়াতের বিষয় বর্ণনা করেছেন তাঁরাই তাঁর খাতমুন নুবুওয়াতের বিষয়ও বর্ণনা করেছেন। সাহাবীগণ সর্বসম্মতভাবে নবুওয়তের দাবিদার এবং তাদের অনুসারীদেরকে ধর্মত্যাগী মুরতাদ বলে গণ্য করেছেন।

৮। ক) মু'জিযা কী?

শাব্দিক অর্থঃ মুজিযা (المعجزة) শব্দটি আরবী ‘ইজায’ (إعجاز) শব্দ থেকে গৃহীত, যার অর্থ ‘অক্ষম করা’। মুজিযা অর্থ ‘অক্ষমকারী অলৌকিক নিদর্শন’’।

পারিভাষিক অর্থঃ নবীগণ তাঁদের নুবুওয়াতের দাবি প্রমাণ করতে যে সকল অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করেন সেগুলোকে ‘মুজিযা’ বলা হয়।

কুরআন-হাদীসে মুজিযা শব্দটি ব্যবহৃত হয় নি, মুজিযা বুঝাতে ‘আয়াত’ (الآية) অর্থাৎ চিহ্ন বা নিদর্শন বলা হয়েছে। পরবর্তী যুগে ‘মুজিযা’ পরিভাষাটির উৎপত্তি। নবী-রাসূলগণ আল্লাহর ইচ্ছায় মুজিযা প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ বলেন:

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ

‘‘আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোনো নিদর্শন (মুজিযা) উপস্থিত করা কোনো রাসূলের কাজ নয়।’’(*সূরা রা'দ: ৩৮)*

অর্থাৎ নবী-রাসূলগণ আল্লাহর ইচ্ছায় ও নির্দেশে মুজিযা প্রদর্শন করেছেন। কুরআন কারীমে নবীগণের অনেক মুজিযার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নূহ (আঃ)-এর নৌকার মুজিযা, ইবরাহীম (আঃ)-এর অগ্নিকুন্ডে নিরাপদ থাকার মুজিযা, মূসা (আঃ)-এর লাঠি ও অন্যান্য মুজিযা, ঈসা (আঃ)-এর মৃতকে জীবিত করা ও অন্যান্য মুজিযা, মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করা, ইসরা, মিরাজ ও অন্যান্য মুজিযা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন হাদীসে এ বিষয়ে অনেক কিছু বলা হয়েছে। এগুলি বিশ্বাস করা মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব।

খ) হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মানুষ ছিলেন নাকি অলৌকিক সত্ত্বা? এ বিষয়ক মতভেদ ও এর সমাধান কুরআন ও হাদীসের আলোকে বর্ণনা করুন।

তাঁর মত (সমান) নয়। আমরা তাঁর মতো মানুষ নই। অতিপ্রাকৃত বিষয়ে কেউই তাঁর মতো নয়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَ لَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ لَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ ؕ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ

বল, ‘তোমাদেরকে আমি বলি না,আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডারসমূহ রয়েছে এবং আমি গায়েব জানি না এবং তোমাদেরকে বলি না, নিশ্চয় আমি ফেরেশতা। আমি কেবল তাই অনুসরণ করি যা আমার কাছে ওহী প্রেরণ করা হয়’। বল, ‘অন্ধ আর চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? অতএব তোমরা কি চিন্তা করবে না’ *(সূরা আল-আন’আম :৫০)*

নবী করিম (সাঃ) বলেন,

‘নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমি ভুলে যাই, যেমনভাবে তোমরা ভুলে যাও। সুতরাং আমি ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে’।(বুখারী: ৪০১; মুসলিম-১২৭৪)

হাদিস মতে তিনিও ভুলে যেতেন। যেমনটা আমরা মানুষের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তিনি যদি অলৌকিক সত্ত্বা হতেন তাহলে তিনি ভুলে যেতেন না।

নবী (সঃ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-“নিশ্চয়ই তুমি মৃত্যুবরণ করবে এবং তারা সকলে মৃত্যু বরণ করবে”।(সূরা যুমার:৩০)।

রাসুল (সঃ) অতি মানব বা কোন অলৌকিক সত্ত্বা ছিলেন না যে তিনি মৃত্যু বরণ করবেন না। বরং তিনি ছিলেন মানুষ নবী,তাই তাঁর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল।

আল্লাহ আরও ইরশাদ করেন,

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا

বল,‘পবিত্র মহান আমার রব! আমি তো একজন মানব-রাসূল ছাড়া কিছু নই’(বনী ইসরাইলঃ৯৩)

অর্থাৎ কুরআনে ও হাদিসের অনেক জায়গায় আল্লাহর রাসুল যে একজন মানুষ তা কিন্তু বলা আছে এবং রাসুল যে আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা ছাড়া কিছু করতে পারতেন না তাও স্পষ্ট করে বলা রয়েছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি রাসুল (সঃ) আল্লাহর প্রেরিত একজন মানব রাসুল ছাড়া কিছুই নয়। তাই এই বিষয়টি আমাদের সবার মেনে নিতে হবে এবং এ কথাও মনে রাখতে হবে রাসুল (সঃ) এর মতো কোন মানুষ দুনিয়াতে আসেনি কিয়ামত পর্যন্তও আসবে না।

৯। ক) আসমানী কিতাব কয়টি ও কী কী?

যে মহান গ্রন্থে আল্লাহর বাণী লিপিবদ্ধ আছে তাকে আসমানি কিতাব বলে। অর্থাৎ নবী-রসুলগণ যাতে সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন, সেজন্য তাদের কাছে ওহি বা আল্লাহর বাণী আসত। এ বাণীসমূহের সমষ্টি আসমানি কিতাব নামে অভিহিত। পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে সর্বমোট আসমানি কিতাব পাঠানো হয়েছে ১০৪ খানা। তার মধ্যে ৪ খানা প্রধান আসমানী কিতাব ও বাকি ১০০ খানা সহিফা।

- **<u>প্রধান ৪ খানা আসমানী কিতাব হলো:</u>**
  - তাওরাত (হজরত মুসা আঃ এর উপর নাজিল হয়)
  - যাবুর (হজরত দাউদ আঃ এর উপর নাজিল হয়)
  - ইনজিল (হজরত ইসা আঃ এর উপর নাজিল হয়)
  - পবিত্র আল কুরআন (হজরত মুহাম্মাদ সাঃ এর উপর নাজিল হয়)
- **বাকি ১০০ খানা সহিফা যথাক্রমে-**
  - ✓ হযরত আদমের আঃ এর উপর ১০ খানা সহিফা
  - ✓ হযরত শীষের আঃ এর উপর ৫০ খানা সহিফা
  - ✓ হযরত ইদ্রিসের আঃ এর উপর ৩০ খানা সহিফা
  - ✓ হযরত ইব্রাহিমের আঃ এর উপর ১০ খানা সহিফা নাজিল করেন।

খ) মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের অলৌকিকত্ব ও সার্বজনীনতা প্রমান করুন।

➢ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের অলৌকিকত্ব:

পবিত্র কুরআন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুজিযা। আর মহান আল্লাহ মানবজাতিকে সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি;বরং তাকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য,অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখানোর জন্য এ কোরআন দিয়েই সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রেরণ করেছেন। কারণ মহাগ্রন্থ আল কোরআন এক শাশ্বত । আল কুরআনের ভাষ্যে অসংখ্য তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশিত হয়েছে যা আল-কুরআনের অলৌকিকতার বিষয়টি অবিসংবাদিত করে তুলেছে।এখানে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হলো-

১। হজরত রাসুল্লাহ সাঃ একজন পরিপূর্ন মরুচারি ব্যাক্তি। জীবনে তিনি কোনোদিন সাগরতো দুরের কথা,কোনো নদী বা ঝর্না দেখারও সুযোগ হয়নি।কিন্তু আল কুরআনে সাগরের এমনসব প্রসঙ্গ এসেছে যা প্রত্যক্ষদশীর অবিজ্ঞতা ছাড়া বর্ণনা করা অসম্বব।সুরা ইউনুসের ২২,সুরা হুদের ৪২, সূরা কাহাফের ৯৯,সুরা নূরের ৪০, সূরা লূকমানের ৩২ নম্বর আয়াতে সামুদ্রিক যান এবং তাতে মানুষের প্রতিক্রিয়া ও কর্মের বিবরণ দিয়েছেন। ঢেউয়ের বর্ণনায় বলা হয়েছে,পাহাড়ের মতো বড় বড় ঢেউ (সূরা হুদঃ৪২),বিভ্রান্ত – বিপদগ্রস্ত অবস্থায় মানুষের একের উপর অন্যের ভেঙে পড়ার উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েচে,তারা একদল আরেক দলের উপর সাগরের ঢেউয়ের মতো পরবে । (সূরা কাহফঃ ৯৯)

বস্তুত আল্লাহর কাছ থেকে নাযিল না হলে আল কুরআনের সমুদ্র বিষয়ক এমন বর্ণনা কোনভাবেই থাকত না।আরবের সমকালীন কালজয়ী কোন সাহিতেই এভাবে সাগর প্রসঙ্গ আসেনি।

২। আল কুরআনের ৩০তম সূরা আর-রুম এক খানা মাক্কি সূরা। এতে পারস্য সাম্রাজ্য ধ্বংসের ভবিষৎবাণী করা হয়েছে। আল্লাহ বলেনঃ

الم (١) غُلِبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٣) فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (٤) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ(5)

"আলিফ-লাম-মীম। রোমকগণ পরাজিত হয়েছে সর্বনিম্ন অঞ্চলে।কিন্তু ওরা ওদের এ পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয় লাভ করবে, কয়েক বছরের মধ্যে ।আগের ও পরের সকল সিদ্ধান্ত আল্লাহরই। সেদিন বিশ্বাসীরা আনন্দিত হবে; আল্লাহর সাহায্যে তিনি যাকে ইচ্ছে সাহায্য করেন এবং তিনিই প্রবলপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।"(সূরা রুমঃ ১-৫)

যখন এ সূরা নাযিল হয় তখন মুসলমানদের অনেক খারাপ অবস্থা। মক্কায় তারা প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার করতে পারছিল না। নও মুসলিমগণ নানান রকমের নির্যাতনের শিকার হচছেন। রাসুল্লাহ সাঃ ও এই নির্যাতন থেকে বাদ যায়নি। এ অবস্তায় মানুষের বিশ্বাস করা অকল্পনীয় ছিল যে মুসলমানদের সুদিন আসবে। আল্লাহর বানীকে সত্য প্রমান করে পারসিকদের বিরুদ্ধে রোমানরা জয়ী হলো আর সেই বছরই বদর যুদ্ধে মুসলমানদের কাছে কাফেরদের পরাজয় ঘটল। আর এই ঘটনাই আল কুরআনের অলৌকিকত্ব প্রমান করে।

৩। আল কুরআনের ৩০তম সূরা আর-রুমের ৩য় আয়াতে আল্লাহ রোমকগণ পারসিকদের কাছে কোথায় পরাজিত হয়েছে তা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেনঃ

فِىٓ اَدْنَى الْاَرْضِ অর্থাৎ পৃথিবীর নিম্নতম অঞ্চলে। সে এলাকাটি সিরিয়া,ফিলিস্তিন ও জর্ডানের ডেড সী এলাকায় অবস্তিত। যখন আয়াত নাযিল হয় তখন এ আয়াতের মর্ম অনুসারে অঞ্চলটিকে পৃথিবীর নিম্নতম অঞ্চল হিসেবে পরিমাপের কোনো আইডিয়া মানুসের ছিল না। অথচ অধুনা আবিষ্কৃত ভূতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রমানিত হয়েছে,অঞ্চলটি সী লেবেল থেকে ৩৯৫ মিটার নিচে,যা গোটা পৃথিবির মধ্যে সবচে নিচু অঞ্চল। এটি আল কুরআনের অলৌকিক একটি দিক।

৪। সূরা বাকারার ২৯তম আয়াতে আল্লাহ سَبۡعَ سَمٰوٰتٍ বা সাতা আসমানের কথা বলেছেন। আল কুরআনে একথাটি মোট ৭বার এসেছে। একইভাবে খালকুস সামাওয়াত বা আকাশসমূহ সৃষ্টির কথা এসেছে ৭বার । এমনকি সাবিয়াতু আইয়াম বা সপ্তাহের ৭ দিন কথাটিও ৭ বারই এসেছে। এটি অলৌকিকত্ব ছাড়া কিছুই নয়।

৫। আল কুরআনে মানুষ সৃষ্টির উপাদান হিসেবে তুরাব বা মাটির কথা বলা হয়েছে ১৭বার,নুতফা বা শুক্রবিন্দুর কথা বলা হয়েছে ১২বার, আলাক বা রক্তবিন্দুর কথা বলা হয়েছে ৬বার,মুদগা বা মাংসপিণ্ডের কথা বলা হয়েছে ১২ বার।,ইযাম বা হাড়ের কথা বলা হয়েছে ১৬বার,লাহম বা মাংসপিণ্ডের কথা বলা হয়েছে ১২বার।এ উপদানগুলো যোগ করলে (১৭+১২+৬+৩+১২+১৫)=৬৫ হয়। অবাক করা ব্যাপার হলো, আল কুরআনে ইনসান শব্দটিও এসেছে ৬৫বার। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আল কুরআনের জন্য অন্যতম অলৌকিকত্ব।

৬। আল কুরআনের সবচেয়ে বড় অলৌকিকত্ব হচ্ছে এর সংরক্ষণ ।আল্লাহ বলেনঃ

اِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا الذِّكۡرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوۡنَ

"অর্থাৎ আমিই কুরআন নাযিল করেছি এবং অবশই আমি এর সংরক্ষক" (সুরা হিজরঃ ৯)

দেড় হাজার বছর আগে আল কুরআন মহান আল্লাহ, যেই রকম ভাবে নাযিল করেছিল আজ পর্যন্ত তা হুবহু একই রকম রয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত একই রকম থাকবে কারন মহান আল্লাহই এর সংরক্ষক। অন্য কোনো কিতাবের ক্ষেত্রে এইরকম দেখা যায় না।

- **<u>আল-কুরআনের সার্বজনীনতা:</u>**

আল্লাহ যে সকল গ্রন্থ অবতরণ করেছেন তাতে একদিকে একমাত্র বিশুদ্ধ বিশ্বাস, আল্লাহর ইবাদত, ভাল ও মন্দ কর্মের ফলাফল, চারিত্রিক বিশুদ্ধতা, সৃষ্টির কল্যাণ, অধিকার সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক ও সত্য জ্ঞান দান করা হয়েছে। অপর দিকে সংশ্লিষ্ট মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন জাগতিক সমস্যা সম্পর্কে সঠিক বিধান, সমাধান ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের বিষয়গুলো মূলত সার্বজনীন। বিশ্বাস, নৈতিক মূল্যবোধ, মানবিক দায়িত্বাবলি সকল যুগের সকল মানুষের জন্য একই প্রকৃতির। দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়গুলো যুগ ও সময়ের পরিবর্তনে কিছু পরিবর্তিত হতে পারে। বিভিন্নযুগে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্নমুখি সামাজিক ও জাগতিক সমস্যা থাকতে পারে এবং এ সকলের সমাধানও বিভিন্ন সমাজে বিভিন্নরকম হতে পারে। এ কারণে প্রথম পর্যায়ের বিষয়গুলো সম্পর্কে সকল আসমানী কিতাবের বর্ণনা ও শিক্ষা একই ধরনের। তবে দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়গুলোর আলোচনা বিভিন্ন গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন অনুসারে করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের পূর্বে আল্লাহ যে সকল গ্রন্থ মানবজাতিকে প্রদান করেছেন তা ছিল নির্দিষ্ট কোনো জাতি ও নির্দিষ্ট একটি সময়কালের জন্য। এ কারণে প্রথম পর্যায়ের বিষয়গুলোর আলোচনা ও ব্যাখ্যায় তৎকালীন জনগোষ্টীর বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিক বিকাশের দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট সমাজের সমস্যা ও তাদের উপযোগী সমাধানই দেওয়া হয়েছে।

মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পূর্বে কোনো নবী-রাসূল তাঁর ধর্মের বা তাঁর কিতাবের সর্বজনীনতা দাবি করেন নি। উপরন্তু নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ছাড়া অন্য মানুষদের কাছে তাঁর ধর্ম বা কিতাব প্রচার করতে নিষেধ করেছেন। এজন্য অধিকাংশ ধর্ম ও ধর্মাবলম্বী তাদের ধর্মকে সর্বজনীন বলে দাবি করেন না।

খৃস্টানগণ তাদের ধর্মকে সর্বজনীন বলে দাবি করেন। অথচ তাদের মধ্যে বিদ্যমান বাইবেলে 'যীশু' বারংবার উল্লেখ করেছেন যে, তিনি কেবলমাত্র 'ইস্রায়েল-সন্তানগণের' জন্য প্রেরিত হয়েছেন। ইস্রায়েল সন্তানগণ ছাড়া অন্যদের নিকট তাঁর ধর্ম প্রচার করতে নিষেধ করেছেন।

পক্ষান্তরে কুরআন কারীম সর্বদা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর শরীয়ত ও কুরআনের নির্দেশনা 'মানব জাতি'র জন্য বলে উল্লেখ করেছে। অন্যত্র মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, কুরআনকে তিনি মানব জাতির জন্য প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেছেন-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

''রামাদান মাস, যাতে মানবজাতির পথ প্রদর্শক এবং সৎপথের সুস্পষ্ট নির্দশন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।''(*সূরা বাকারা: ১৮৫)*

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

''এটি এমন একটি কিতাব যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যেন আপনি মানব জাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে নিয়ে আসেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, তাঁর পথে যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসিত।''
(*সূরা ইব্রাহিম :১)*

এজন্য কুরআন কারীমে প্রথম পর্যায়ের বিষয়গুলো, অর্থাৎ সঠিক বিশ্বাস (সহীহ আকীদা), নৈতিক মূল্যবোধ, মানবিক দায়িত্বাবলি, সৎ ও অসৎ কর্মের বিবরণ ও পরিণতি বর্ণনায় এমন এক পরিপূর্ণ স্পষ্টতার অনুসরণ করা হয়েছে যেন, সকল যুগে সকল সমাজের মানুষই সাধারণ ভাষাজ্ঞানের মাধ্যমেই এর শিক্ষা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। অপর দিকে দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়গুলো, অর্থাৎ সামাজিক, জাগতিক বা বৈষয়িক সমস্যাসমূহের সঠিক ও কল্যাণমূখী সমাধান প্রদানের ক্ষেত্রে এরূপভাবে মূলনীতিগুলো বর্ণনা করা হয়েছে যেন সকল যুগের সকল সমাজের মানুষেরা এর অনুসরণ করতে পারে, আবার বিস্তারিত প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমাজের চাহিদা, মূল্যবোধ, ও নিয়মনীতির সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় থাকে। আর এসব কিছুই সকল যুগের সকল মানুষের জন্য সহজ ও সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যেন সকলেই তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

''নিশ্চয় আমি কুরআনকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য সহজ করেছি,শিক্ষা গ্রহণের জন্য কি কেউ আছে?'' (সূরা ক্বামার: ১৭)

১০। ক) মালাইকার (ফেরেশতার) পরিচয় দিন।

'ফেরেশতা' মূলত একটি ফার্সি শব্দ। আরবির 'মালাকুন' (একবচন) ও 'মালাইকা' (বহুবচন)-এর প্রতিশব্দ এটি। কোরআন ও হাদিসে 'মালাইকা' শব্দটিই ব্যবহৃত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বার্তাবাহক। ইসলামের পরিভাষায় ফেরেশতা এমন 'নুরানি' (আলোকিত) সৃষ্টির নাম, যারা যেকোনো সময় বিভিন্ন রূপ-আকৃতি ধারণ করতে পারেন। তারা কখনো আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করেন না। বরং সর্বদা আল্লাহর নির্দেশ আত্মসমর্পিত থাকেন।

ফেরেশতারা সবসময় আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকেন। পানাহার, বৈবাহিক ও জৈবিক চাহিদা থেকে তারা পুরোপুরি মুক্ত থাকেন। তারা পুরুষও নন, নারীও নন। আল্লাহর হুকুমে ফেরেশতারা বিভিন্ন আকার ও রূপ ধারণ করতে পারেন। মানুষের মতো রক্ত-মাংসের সৃষ্টি না হওয়ায়,তাদের কামনা-বাসনা,পানাহারের প্রয়োজনীয়তা ও ঘুম-বিশ্রাম কিছুই নেই। তাদের সংখ্যা মোট কত,তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না।আর সকল ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস রাখা আমাদের ইমানী দায়িত্ব।

আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের সম্পর্কে বলেন:-

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَ اسْتَكْبَرَ ۫ وَ كَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ

"আর স্মরণ করুন,যখন আমরা ফেরেশতাদের বললাম,আদমকে সিজদা কর তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজদা করল; সে অস্বীকার করল ও অহংকার করল। আর সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হল।"(সূরা বাকারাঃ ৩৪)

আল্লাহ আরও ইরশাদ করেন,

فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ هُمْ لَا يَسْـَٔمُوْنَ

"অতঃপর যদি তারা অহংকার করে,তবে যারা আপনার রবের নিকটে রয়েছে তারা তো দিন ও রাতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্তি বোধ করে না।" (সাজদাহঃ ৩৮)

অর্থাৎ ফেরেশতাগন আল্লাহ তায়ালার পবিত্র সৃষ্টি। আল্লাহ তায়ালা যা আদেশ করেন তাঁরা তাই পালন করে।

৪ জন প্রধান ফেরেশতার নাম নিম্নে উল্লেখ্য করা হলো-

১. জিবরাইল (আ.)
২. মিকাইল (আ.)
৩. ইসরাফিল (আ.)
৪. আজরাইল (আ.)

খ) মালাইকার প্রতি বিশ্বাসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং এদের কর্ম ও দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

➢ **মালাইকার প্রতি বিশ্বাসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা**

আমরা দেখেছি যে, অদৃশ্য জগতের বিষয়ে আল্লাহ আমাদেরকে কেবলমাত্র সে সকল বিষয়ই জানিয়েছেন এবং বিশ্বাস করতে নির্দেশ দিয়েছেন যার বিশ্বাস আমাদের জীবনে কল্যাণ ও পূর্ণতা বয়ে আনে। আমরা একটু চিন্তা করলেই মালাকগণে বিশ্বাসের কল্যাণ অনুভব করতে পারব।

এই বিশ্বাসের সবচেয়ে বড় কল্যাণ, আমরা আল্লাহর এই সম্মানিত বান্দাদের সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করি এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত নানা ধরণের কূসংস্কার, অলীক বিশ্বাস, অতিভক্তি, শিরক ইত্যাদি থেকে আমরা রক্ষা পাই, যে সকল কুসংস্কার মানুষের ইহলৌকিক জীবনকে অস্থিরচিত্ত, ভীত সন্ত্রস্থ করে তুলে, কল্যাণের কামনায় তারা এখানে সেখানে ছুটে বেড়ায়, তাদের ব্যক্তিত্ব হয়ে যায় বহুবিভক্ত। উপরন্তু এসকল কুসংস্কার তাদের জন্য বয়ে আনে পরলৌকিক ধ্বংস ও সর্বনাশ, কারণ আমরা জানি যে, শিরকের একমাত্র পরিণতি জাহান্নামের অনন্ত শাস্তি।

এছাড়া ফিরিশতাদের উপর বিশ্বাস আনার ফলে আমরা আল্লাহর সৃষ্টির মহত্ব জানতে পারি। এ বিশ্বাস আমাদের মনে শান্তি বয়ে আনে। একজন বিশ্বাসী কখনই নিজেকে অসহায় মনে করেনা। একাকিত্বের অনুভূতি কখনই তাকে গ্রাস করবে না। তিনি সর্বদা অনূভব করেন যে, আল্লাহর অগণিত ফিরিশতা তাকে ঘিরে রেখেছেন, তাঁদের দু'আ তাকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে। সকল কষ্ট, সকল বেদনা উত্তরণে তিনি সাহস ও প্রেরণা পাবেন। ধৈর্য ও দৃঢ়তা নিয়ে তিনি সকল হতাশাকে জয় করতে পারবেন।মালাকগণে বিশ্বাস মানুষকে কল্যাণ ও সততার পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে।

আল্লাহ বলেন,

"কল্যাণ-কর্মে রত মানুষের জন্য প্রার্থনা করেন মালাকগণ।"

একজন মুসলিম অন্যান্য মুসলিমের কল্যাণের জন্য তাদের অনুপস্থিতে অন্তরের আকুতি দিয়ে দু'আ করেন, কারণ তিনি জানেন যে, এ দু'আর ফলে তিনিও লাভবান হবেন। আল্লাহর মালাকগণ তার জন্য দু'আ করেন। এমনিভাবে সকল ন্যায় ও কল্যাণের কাজে তিনি প্রেরণা ও উৎসাহবোধ করেন।

এ ছাড়া মালাকগণের প্রতি ঈমান আনা ছাড়া কেউ মুসলমান হতে পারবে না। কারন ঈমানের ৭ টি রুকুন যথাঃ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, রাসুলগনের প্রতি বিশ্বাস,মালাকগনের প্রতি বিশ্বাস, আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস, আসমানি কিতাবের প্রতি বিশ্বাস, তাকদির এর প্রতি বিশ্বাস, পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বই,।এর মধ্যে মালাকগণের প্রতি বিশ্বাস অন্যতম।

এ ছাড়া মালাকগণের প্রতি ঈমান আমাদের আল্লাহর সৃষ্টির মহত্ব, বিশালত্ব ও বৈচিত্র সম্পর্কে জ্ঞানদান করে। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনুপ্রেরণা দেয়। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সত্যিকারের ঈমান দান করুন।

➢ **<u>মালাকগনের কর্ম ও দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা:</u>**

মালাইকা বা ফিরিশতাগণ মানবীয় দূর্বলতা, ক্লান্তি, কামনা বাসনা বা পাপেচ্ছা থেকে মুক্ত। তাঁরা সর্বদা ক্লান্তিহীনভাবে আল্লাহর গুণগান করেন এবং তাঁর নিদের্শ পালন করেন। মালাকগনের বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন:

‘‘তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা আগে বেড়ে কথা বলে না; তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে।’’

অন্যত্র আল্লাহ তাঁদের বিষয়ে বলেন:

لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون

‘ ‘আল্লাহ তাঁদেরকে যে নির্দেশ দেন তা তাঁরা লঙ্ঘন করে না এবং তাঁদেরকে যে নির্দেশ দেওয়া হয় তা তাঁরা পালন করে।’’(সূরা তাহরিমঃ ৬)

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْتُرُونَ

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা তাঁরই (আল্লাহরই)। আর তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে তারা অহঙ্কারবশে তাঁর ইবাদত করা হতে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না। তারা দিবা-রাত্র তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তারা শৈথিল্য করে না।’’(সূরা আম্বিয়াঃ ২০)

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ

‘ ‘যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা অহংকারে তাঁর ইবাদতে বিমুখ হয় না, তাঁরই মহিমা ঘোষণা করে এবং তাঁরই নিকট সাজদাবনত হয়।’’(সূরা আ’রাফঃ ২০৬)

- <u>তাঁদের কর্ম ও দায়িত্ব</u>:

সাধারণভাবে আল্লাহর ইবাদত, তাসবীহ ও তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা ছাড়াও মালাকগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে প্রদত্ত বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। মহান আল্লাহ বিশ্ব পরিচালনায় তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য তাঁদেরকে দায়িত্ব দেন। মহান আল্লাহ বলেন:

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا

‘‘শপথ তাদের যারা নির্মমভাবে উৎপাটন করে। এবং যারা মৃদুভাবে বন্ধনমুক্ত করে দেয়। এবং যারা তীব্র গতিতে সন্তরণ করে। আর যারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়। অতঃপর যারা কর্ম নির্বাহ করে।’’(সূরা নাজিয়াতঃ ১-৫)

মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, এখানে মালাকগণকেই বুঝানো হয়েছে। তাঁদের কেউ কাফিরদের প্রাণ নির্মমভাবে উৎপাটন করেন, কেউ মুমিনের প্রাণ মৃদুভাবে বন্ধনমুক্ত করেন, কেউ আল্লাহর নির্দেশাবলি নিয়ে মহাবিশ্বে সন্তরণ, চলাচল বা যাতায়াত করেন এবং কেউ আল্লাহর নির্দেশিত কর্মসমূহ নির্বাহ করেন।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا

‘‘শপথ কর্মবণ্টনকারীগণের (কর্মবণ্টনকারী মালাকগণের)।’’(সূরা জারিয়াতঃ ৪)

এভাবে আমরা সাধারণভাবে ফিরিশতাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে পারি। এছাড়া কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা থেকে আমরা তাঁদের বিভিন্ন বিশেষ দায়িত্ব ও কর্ম সম্পর্কে জানতে পারি। তাঁদের এ সকল দায়িত্ব ও কর্মের মধ্যে রয়েছে:

- <u>ওহী পৌঁছানো:</u>

মালাকগণের একটি মৌলিক দয়িত্ব নবী রাসূলগণের নিকট আল্লাহর ওহী পৌঁছান। জিবরাঈল (আঃ) রাসুলুল্লাহ সাঃ এর কাছে আল্লার ওহী নিয়ে আসতেন।আল্লাহ বলেনঃ

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُدًى وَّ بُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

বলুন, যে কেউ জিবরীলের শত্রু হবে,এজন্যে যে,তিনি আল্লাহর অনুমতিক্রমে আপনার হৃদয়ে কুরআন নাযিল করেছেন,যা পূর্ববর্তী কিতাবেরও সত্যায়ণকারী এবং যা মুমিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও শুভ সংবাদ’।

❖ **মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ:**

মালাকগণের অন্য একটি দায়িত্ব আল্লাহর হুকুমে তাঁরই মর্জিমত মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ করা। মহান আল্লাহ বলেন:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ

''মানুষের জন্য তার সামনে ও তার পিছনে একের পর এক প্রহরী থাকে, তারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে।''(সূরা রা'দঃ ১১)

❖ **মানুষকে কল্যাণ-কর্মে উৎসাহ প্রদান:**

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِابْنِ آدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِيعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِيعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ ... ثُمَّ قَرَأَ: (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ) الآية

''শয়তান মানুষের মনে প্রেরণা জাগায়, আবার মালাকও (ফিরিশতাও) মানুষের মনে প্রেরণা জাগায়। শয়তানের প্রেরণা অশুভ ও অকল্যানের ওয়াদা করা এবং সত্যকে অস্বীকার করার প্রেরণা। মালাকের প্রেরণা হলো কল্যাণের ও মঙ্গলের ওয়াদা করা এবং সত্যকে মেনে নেয়া। ... এরপর তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন: ''শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং অশ্ললতা-কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।''(তিরমিযী, আস-সুনান ৫/২১৯)

❖ **মুমিনদের জন্য দু'আ করা**

মালাকগণের একটি বিশেষ কর্ম বিশ্বাসীদের কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ ও দু'আ করা। মহান আল্লাহ বলেন:

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

''যারা আর্শ ধারণ করে আছে এবং যারা তার চতুর্পাশ্ব ঘিরে আছে তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী, অতএব যারা তওবা করে এবং তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাদের ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর। হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি তাদেরকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছ, এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নি ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরকেও। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।''(সুরা মুমিন: ৭-৯)

বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, দান, অনুপস্থিত মানুষদের জন্য দু'আ ও অন্যান্য সৎকর্মে লিপ্ত মুমিনদের জন্য ফিরিশতাগণ দু'আ করেন।

➢ **মানুষের কর্ম লিপিবদ্ধ করা**

কুরআন কারীমের অনেক আয়াত ও বিভিন্ন হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ প্রতিটি মানুষের সাথে মালাক নিয়োগ করেছেন তার সৎ-অসৎ সকল কর্ম লিপিবদ্ধ করার জন্য। কুরআন কারীমে তাঁদেরকে ''কিরামান কাতিবীন'' বা সম্মানিত লেখকগণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন:

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

''দুই গ্রহণকারী (ফিরিশতা) তার ডানে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।''(সূরা কাফ: ১৭-১৮)

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

''অবশ্যই আছে তোমাদের জন্য তত্ত্বাবধায়কগণ; সম্মানিত লিপিকারবৃন্দ। তারা জানে তোমরা যা কর।'' (সূরা ইনফিতার: ১০-১২)

- **মৃত্যুর সময় আত্মাগ্রহণ**

কুরআন- হাদীস থেকে আমরা জানি যে, মৃত্যুর সময় মানুষের আত্মা গ্রহণ করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একদল মালাককে।

আল্লাহ বলেন:

حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ

''অবশেষে যখন তোমাদের কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিত দূতগণ তার মৃত্যু ঘটায় এবং তারা কোনো ত্রুটি করে না।''(সূরা আন'আম: ৬১)

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

''আপনি বলুন, তোমাদের জন্য নিযুক্ত 'মালাকুল মাওত' (মৃত্যুর মালাক) তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অবশেষে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যানীত হবে।''(সুরা সাজদা: ১১)

কুরআনে বা নির্ভরযোগ্য হাদীসে 'মালাকুল মাউতের' নাম উল্লেখ করা হয়নি। তবে কোনো কোনো মুফাসসিরগণ তাঁর নাম আযরাঈল বলে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী যামানার মুসলিমদের মধ্যে এই নামই প্রসিদ্ধ।

- **আরশ বহন করা**

মালাইকা বা ফিরিশতাগণের একটি বিশেষ কর্ম মহান আরশ বহন করা। এ বিষয়ে কুরআনের একটি আয়াত আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ

''এবং সেইদিন আটজন (মালাক) তাদের প্রতিপালকের আর্শকে ধারণ করবে তাদের উর্ধ্বে।''(সূরা হাক্কা: ১৭)

- **অন্যান্য কর্ম:**

এছাড়া কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা জানি যে, আল্লাহ বিভিন্ন সৃষ্টির পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষনের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর মালাককে দায়িত্ব দিয়েছেন। চাঁদ-সূর্যের জন্য, পাহাড়-পর্বতের জন্য, আকাশের বিভিন্ন স্থানের জন্য, মেঘের জন্য, বৃষ্টির জন্য, মাতৃগর্ভের ভ্রুনের জন্য, জাহান্নামের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, পাপীদের শাস্তিদানের জন্য, জান্নাতবাসী মুমিনদের খেদমত ও শান্তিদানের জন্য বিভিন্ন মালাককে দয়িত্ব প্রদান করেছেন আল্লাহ।

মুসলিমদের জিকিরের মাজলিস, আলোচনার মজলিস, ইলমের মাজলিস, সালাতের জামাত ইত্যাদি সৎকর্মে উপস্থিত থাকেন কিছু মালাক, বিশ্বের সকল প্রান্ত থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য প্রেরিত সালাত ও সালাম তাঁর রওযা মুবারকে পৌঁছে দেন কিছু মালাক, মৃত্যুর পরে বা কবরে মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন মুনকার নাকির নামক মালাক। 'মালিক' (আঃ)-কে দিয়েছেন জাহান্নামের তত্বাবধানের দায়িত্বে। ইস্রাফিল (আঃ)-কে দিয়েছেন কিয়ামতের সিংগায় ফুৎকার দানের দায়িত্ব। মিকাঈল ফিরিশতা বৃষ্টিপাত ও ফল-ফসলের দায়িত্বে নিয়োজিত। এভাবে বিভিন্ন হাদীস থেকে বিশ্বজগতের বিভিন্ন সৃষ্টির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন ফিরিশতাদের কথা আমরা জানতে পারি যারা বিশ্বজগত পরিচালনায় আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশের বাস্তবায়ন করেন। তাই মুসলিমরা বিশ্বাস করেন যে,চাঁদ,সূর্য,মেঘ,বৃষ্টি ইত্যাদি আল্লাহর সকল সৃষ্টি যেমন তাঁরই সৃষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন,তেমনি এসকল সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর নিয়ম ও নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য রয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত মালাকগণ। সকল সৃষ্টি তাঁরই নিয়ন্ত্রনে,সকল প্রাকৃতিক নিয়ম তাঁরই সৃষ্টি,ফিরিশতাগণ তাঁরই দাস। সবকিছু তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশের অধীনে। একমাত্র তাঁর ইচ্ছাই চূড়ান্ত,তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।(বনু হাজার,ফাতহুল বারী ৬/৩১১-৩১৭)

১১। ক) নবী ও রাসূলের পরিচয় দিন। নবী-রাসুলদের প্রেরণের উদ্দেশ্য কী?

- **নবী ও রাসূলের পরিচয়:**

নবী ও রাসুলগণ আল্লাহর মনোনীত বান্দা। তাঁদের একমাত্র কাজ মানুষকে এক আল্লাহর দিকে ডাকা। সত্য বঞ্চিত,পথভ্রষ্ট ও অন্দকারাছন্ন মানুষকে আলোর পথে সঠিক পথে পরিচালিত করা। যুগে যুগে আল্লাহ অসঙ্খ নবী রাসুল প্রেরন করেছেন। তাঁর মধ্যে প্রথম নবী হজরত আদম আঃ ও শেষ নবী হজরত মুহাম্মাদ সাঃ।

নবী

শাব্দিক অর্থঃ 'নবী' (النبيّ) শব্দটি 'নূন, বা ও হামযা' তিন বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত আরবী(نَبَأَ) ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত। 'নাবা' (النَّبَأُ) অর্থ সংবাদ, খবর ইত্যাদি। ক্রিয়া হিসেবে আম্বাআ (أَنْبَأَ) ও নাব্বাআ (نَبَّأَ) অর্থ সংবাদ প্রদান, বলা বা জানানো। শব্দটির শেষ অক্ষর হামযা। এজন্য 'আন-নাবিইউ' (النبيُّ)শব্দটি মূলে ছিল 'আন-নাবী-উ (النبيء)। অত্যধিক ব্যবহারের ফলে হামযাটি পরিবর্তিত হয়ে ইয়া-তে রূপান্তরিত হয়েছে। 'আন-নাবিইউ' শব্দটির অর্থ সংবাদদাতা।

আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষদেরকে 'সংবাদ' প্রদানের অর্থেই 'নবী' বলা হয়।

পারিভারষিক অর্থঃ ধর্মীয় পরিভাষায় নবী অর্থ যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রাপ্ত কল্যাণ অকল্যাণ, শুভ-অশুভ বিভিন্ন কর্মের পথ ও পরিণতি সম্পর্কে সকল সংবাদ মানুষকে জানান, পরকাল, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষদেরক সংবাদ দান করেন

রাসুল

শাব্দিক অর্থঃ রাসূল (الرسول) শব্দটির আভিধানিক অর্থ প্রেরিত, দূত ইত্যাদি। আরবী 'আরসালা' (أرسل) অর্থ প্রেরণ করা। অন্যের পক্ষ থেকে কোনো সংবাদ, তথ্য বা বাণী নিয়ে যিনি আগমন করেন তাকে রাসূল বলা হয়।

পারিভাষিক অর্থঃ যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ওহীর মাধ্যমে, প্রাপ্ত বার্তা বা শিক্ষা আল্লাহর প্রেরিত দূত হিসেবে মানুষদের কাছে পৌঁছে দেন।

আমরা দেখতে পাই যে,অর্থের দিক থেকে দুইটি শব্দই প্রায়ই সমার্থক। শব্দদুটির মধ্যে পারিভাষিক ও ব্যবহারিক পার্থক্য রয়েছে যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী প্রাপ্ত প্রত্যেক মানুষকেই নবী বলা হয়। যদি কোনো ওহী প্রাপ্ত মানুষকে আল্লাহর নতুন বিধানাবলী দান করে তা প্রচারের নির্দেশ দান করেন তাহলে তাঁকে রাসূল বলা হয়।

আর যদি তাঁকে শুধু ওহীর মাধ্যমে, আল্লাহর বাণী দান করা হয়, নতুন কোনো বিধান প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া না হয় তাহলে তিনি রাসূল নন, কেবলমাত্র নবী বলে আখ্যায়িত হন। রিসালাত (الرسالة)বা রাসূলের দায়িত্বর চেয়ে নুবুওয়াত (النبوة)বা নবীর দায়িত্ব সাধারণতর। এ জন্য সকল রাসূলই নবী, কিন্তু সকল নবীই রাসূল নন। যে কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে দীন বা শরীয়ত বিষয়ক কোনো নির্দেশনা লাভ করেন তিনিই নবী। আর রাসূল অতিরিক্ত কিছু দায়িত্ব লাভ করেন।

- **নবী-রাসুলদের প্রেরণের উদ্দেশ্য:**

নবী-রাসুল প্রেরণের অন্যতম তিন কারণ:

(১)মানুষ সৎপথে চলার যোগ্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে প্রবৃত্তির তাড়নায়, শয়তানের প্ররোচনায় ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে সাধারণত অসৎ পথে পরিচালিত হয়। তাই মহান আল্লাহ তাদের সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য তাঁর পথে ডাকার বা আহ্বান করার জন্য নবী-রাসুল প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا

"আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি।" (সুরা আহজাব, আয়াত ৪৬)

(২) আল্লাহর সত্তা অসীম, কিন্তু মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি সসীম। এ সসীম জ্ঞান দ্বারা অসীম আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলির পরিচয় লাভ করা সম্ভব নয়। তাই মহান আল্লাহ দয়াপরবশ হয়ে নবী-রাসুল প্রেরণ করেছেন।

তাঁদের দিয়েছেন দিকনির্দেশনারূপে বহু কিতাব ও সহিফা। নবী-রাসুল এবং তাঁদের প্রতি নাজিলকৃত কিতাবের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহকে চিনতে পারে। তাঁর হুকুম-আহকাম জানতে পারে।

আল্লাহ ইরশাদ করেন,

أُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ-

'আপনি আপনার পালনকর্তার প্রতি দাওয়াত দিন কুরআন বা সঠিক জ্ঞান এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে। আর পছন্দনীয় পন্থায় প্রত্যুত্তর করুন' (সুরা নাহলঃ ১২৫)।

(৩) ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান এবং বুদ্ধি-বিবেচনালব্ধ জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। রয়েছে নানা ধরনের ভুলভ্রান্তির আশঙ্কা। কিন্তু নবী-রাসুলদের মাধ্যমে প্রাপ্ত অহিভিত্তিক জ্ঞানে ভুলভ্রান্তির কোনো আশঙ্কা নেই। তাই মহান আল্লাহ নবী-রাসুল প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ ইরশাদ করেন,

أَدْعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۖ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيۖ

"আমি জেনে-বুঝে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও।" *(সূরা: ইউসুফ: ১০৮)*
সুতরাং আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে হলে জেনে বুঝে দাওয়াত দিতে হবে, নিজে অজ্ঞ হয়ে নয়।যেমনটা করেছিলেন নবি রাসুলগন। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত ।

পরিষেশে আমরা বলতে পারি নবি রাসুল প্রেরনের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো মানবজাতিকে অন্ধকার পথ থেকে আলোর পথে পরিচালিত করা।

খ) নবী-রাসুলদের সংখ্যা সম্পর্কে আলোচনা করুন এবং কুরআনের-উল্লেখিত নবী-রাসূলদের নাম লিখুন।

➢ **নবী রাসূলগণের সংখ্যা:**

কুরআনের বর্ণনা অনুসারে আমরা জানতে পারি যে, মহান আল্লাহ সকল যুগে সকল সমাজেই নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেন:

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ

''প্রত্যেক জাতিতেই সর্তককারী প্রেরণ করা হয়েছে।''*[সূরা (৩৫) ফাতির: ২৪ আয়াত]*

অন্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ

''প্রত্যেক জাতির জন্য রয়েছে একজন রাসূল, আর যখন কোনো জাতির রাসূল তাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন তখন তাদের মধ্যে ন্যায় বিচারের মাধ্যমে ফয়সালা দান করা হয়েছে, এবং তাদেরকে জুলুম করা হয়নি।''*[সূরা (১০) ইউনূস: ৪৭ আয়াত]*

এসকল সতর্ককারী নবী-রাসূলের বিস্তারিত বিবরণ মহান আল্লাহ জানাননি। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে:

وَرُسُلا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ

''অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের কথা ইতোপূর্বে আপনাকে বলেছি এবং অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের কথা আমি আপনাকে বলি নি।''*[সূরা (৪) নিসা: ১৬৪ আয়াত]*

নবী-রাসূলদের সংখ্যার বিষয়ে কোনো প্রসিদ্ধ গ্রন্থে কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। মুসনাদ আহমদ, মুসনাদ আবী ইয়ালা মাওসিলী, সহীহ ইবন হিববান ইত্যাদি গ্রন্থে বিভিন্ন সনদে সংকলিত কয়েকটি হাদীসে এ বিষয়ে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবীগণের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৪ হাজার। অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে নবীগণের সংখ্যা ছিল ৮ হাজার। অন্য হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবীগণের সংখ্যা এক হাজার বা তার

বেশি ছিল। একাধিক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলগণের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন বা ৩১৫ জন। এ সকল হাদীসের অধিকাংশই দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে। সামগ্রিক বিচারে একাধিক সনদের কারণে কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীসগুলিকে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।[মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাহ ৬/৩৫৮-৩৬৯]

যেহেতু এ বিষয়ক সংখ্যাগুলি খাবারু ওয়াহিদ পর্যায়ের হাদীস এবং বিশেষত এগুলির সনদে দুর্বলতা রয়েছে, সেহেতু এ বিষয়ে সুনিশ্চিত কিছু না বলাই উত্তম বলে মত প্রকাশ করেছেন মুহাক্কিক আলিমগণ। মোল্লা আলী কারী বলেন: ''বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে নবীগণের সংখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেন: ১ লক্ষ ২৪ হাজার। কোনো কোনো বর্ণনায়: ২ লক্ষ ২৪ হাজার। তবে তাঁদের বিষয়ে কোনো সংখ্যা নির্ধারণ না করাই উত্তম।''[মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ৯৯-১০০]

তিনি আরো বলেন: ''উত্তম এই যে, নবীগণের সংখ্যা নির্ধারিত সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখা; কারন 'খাবারুল ওয়াহিত' পর্যায়ের হাদীসের উপরে আকীদার বিষয়ে নির্ভর করা যায় না। বরং জরুরী এই যে, আল্লাহ যেভাবে বলেছেন সেভাবে সাধারণভাবে নবী-রাসূলগণের উপর ঈমান আনা ... ফিরিশতাগণেল সংখ্যা, কিতাবসমূহের সংখ্যা, নবীগণের সংখ্যা, রাসূলগণের সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে মনোনিবেশ না করা।''[মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১০১]

➢ **কুরআনে ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে:**

আদম, ইদরিস, নূহ, হুদ, সালিহ, ইবরাহীম, লূত, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব, ইউসূফ, আইয়ূব, শুয়াইব, মূসা, হারূন, ইউনূস, দাউদ, সুলাইমান, ইল্ইয়াস, ইল্ইয়াসা', যুলকিফল, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা, মুহাম্মাদ

(عليهم الصلاة والسلام)

১২। ক) আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

➢ **আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব:**

কুরআনে পরকালে বিশ্বাসকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, স্রষ্টায় বিশ্বাস সকল সমাজের সকল মানুষের মধ্যে সার্বজনীন বিশ্বাস, যা মানুষের জন্মগত অনুভূতির অংশ। পরকালের জীবনে বিশ্বাস ছাড়া স্রষ্টার প্রতি এই বিশ্বাস অর্থহীন হয়ে যায়। এই অর্থহীন বিশ্বাস ছিল মক্কার কাফিরদের মধ্যে। মক্কার কাফিরেরা ঈমানের অন্যান্য কিছু বিষয় বিকৃতভাবে বিশ্বাস করলেও তাদের মধ্যে অনেকেই পরকালে বা পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করত না এবং অনেকে অস্পষ্টভাবে কিছু ধারণা পোষণ করত। কুরআন কারীমে কাফিরদের এ বিভ্রান্তি এবং আখিরাতে বিশ্বাসের আবশ্যকতা, যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব বারংবার আলোচনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আখেরাতের বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে তাদের অবিশ্বাস বিষয়ক যুক্তি-তর্ক খন্ডন করা হয়েছে এবং সেগুলির অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে।

কুরআনের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহে বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো পরকালীন জীবনে বিশ্বাস করা। কুরআন কারীমে ঈমানের নির্দেশনা জ্ঞাপক আয়াতগুলিতে সর্বদা 'আখিরাত' বা 'শেষ দিবসে' ঈমান আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

অর্থঃ যে আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে, তারা আল্লাহর নিকট নিজ প্রতিদানের উপযুক্ত হবে এবং তাদের কোনও ভয় থাকবে না আর তারা কোনও দুঃখেও ভুগবে না। [সূরা বাকারা: ৬২]

وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ

আর তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং পরকালের প্রতিও তারা নিশ্চিত বিশ্বাসী। [সূরা বাকারা: ০৪]

বস্তুত কুরআন কারীম পাঠ করলে যে কোনো পাঠক বুঝতে পারেন যে, দুটি বিষয়কে কুরআন কারীমে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে:

(১) আল্লাহর ইবাদতের একত্ব বা তাওহীদুল ইবাদাত

(২) আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব। কুরআন কারীমের এমন একটি পৃষ্ঠাও পাওয়া কষ্ট যে পৃষ্ঠাতে আখিরাতের কোনো না কোনো বর্ণনা নেই।

আমরা সাধারণভাবে বুঝতে পারি যে, আল্লাহয় বিশ্বাসী ধার্মিক মানুষের কঠিনতম পদস্খলন ও বিভ্রান্তির দুটি পথ: (১) শিরকে নিপতিত হওয়া এবং (২) আখিরাত সম্পর্কে অসচেতনতা। অনেক সময় বিশ্বাসী মানুষও পার্থিব বিষয়াদি নিয়ে অতি-ব্যস্ততা, অস্থিরতা, অসচেতনতা বা শয়তানী প্ররোচনার কারণে আখিরাত সম্পর্কে অসচেতন হয়ে পড়েন বা আখিরাতের জীবনকে অবজ্ঞা করতে থাকেন। এই ভয়ঙ্করতম পদস্খলন থেকে মুমিনকে রক্ষা করার জন্য সদা-সর্বদা আখিরাতের স্মরণ অত্যান্ত প্রয়োজনীয়। বাহ্যত তাওহীদুল ইবাদাত ও আখিরাতের বিষয়ে কুরআনের বিশেষ গুরুত্বপ্রদানের এ হলো একটি কারণ।

খ) "মানুষ কবর জীবনে শান্তির সম্মুখীন হবে"/ "আখেরাতে বিশ্বাস দুনিয়ার জীবন সুন্দর করার চাবিকাঠি" ব্যাখ্যা করুন।

আখেরাতের প্রতি ইমান আনা আবশ্যক। তাওহিদ ও রেসালাতে বিশ্বাসের পাশাপাশি আখেরাতেও বিশ্বাস করা অত্যাবশ্যক। কোরআনে কারিমে বলা হয়েছে,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا

‘হে মুমিনরা! তোমরা বিশ্বাস করো আল্লাহর প্রতি, তার রাসুলের প্রতি এবং সে কিতাবের প্রতি যা তিনি তার রাসুলের ওপর অবতীর্ণ করেছেন এবং সে কিতাবের প্রতি যা তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন। আর যে আল্লাহ, তার ফেরেশতারা তার কিতাবগুলো, তার রাসুলরা এবং শেষ দিনকে অস্বীকার করবে, সে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হবে।’ [সুরা আন নিসা : ১৩৬]

আখেরাতে বিশ্বাস একজন মানুষকে সৎকর্মশীল করে তোলে। ফলে মানুষ উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতার গুণাবলি অনুশীলন করে। অথচ মানুষ আখেরাতকে বিশ্বাস না করে দুনিয়াকেই সবকিছু মনে করে। এতে অন্যায়-অত্যাচার, অনৈতিক কার্যকলাপসহ দুনিয়ার স্বার্থ হা সিল করে। কিন্তু একজন মুমিন আখেরাত বিশ্বাসের ফলে এসব কাজ থেকে বিরত থাকে এবং আরও পবিত্র হয়ে ওঠে।

১৩। ক) কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে? বিস্তারিত লিখুন।

কিয়ামত বা মহা প্রলয় ও পুনরুত্থান অবশ্যই আসবে। তবে তার নির্ধারিত সময় মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। পৃথিবীর বয়স কত হবে, কখন কিয়ামত হবে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। কুরআন কারীমে বিষয়টি বারংবার বলা হয়েছে। একস্থানে আল্লাহ বলেন:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ

‘‘তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত কখন ঘটবে। বল, ‘এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকেরই আছে। শুধু তিনিই যথাকালে তা প্রকাশ করবেন। তা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা। আকস্মিক ভাবেই তা তোমাদের উপর আসবে’। তুমি এ বিষয়ে সবিশেষ অবহিত মনে করে তারা তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, ‘এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহরই আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জ্ঞাত নয়।’’[সূরা (৭) আ‘রাফ: ১৮৭ আয়াত]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

‘‘বল, ‘আল্লাহ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই গাইবের (অদৃশ্যের) জ্ঞান রাখে না এবং তারা জানে না তারা কখন পুনরুত্থিত হবে।’’[সূরা নামল: ৬৫ আয়াত]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا

‘‘তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত সম্পর্কে, ‘তা কখন ঘটবে?’ কিয়ামতের আলোচনার সাথে তোমার কি সম্পর্ক? এর চূড়ান্ত জ্ঞান আছে তোমার প্রতিপালকের নিকট। যে তা ভয় করে তুমি কেবল তার সতর্ককারী।’’[সূরা (৭৯) নাযি‘আত: ৪২-৪৫ আয়াত]

খ) কিয়ামতের আলামত কত প্রকার? সবিস্তার উল্লেখ করুন।

➢ **কিয়ামতের আলামতের প্রকার:**

কিয়ামতের বিষয়ে কুরআন কারীমে ও হাদীস শরীফে বিভিন্ন পূর্বভাস উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলি মুমিন সরল অন্তকরণে সহজভাবে বিশ্বাস করেন। কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলিমগণ এগুলি মধ্যে কিছু বিষয়কে ‘আলামাত সুগরা’ (العلامات الصغرى) অর্থাৎ ‘‘ক্ষুদ্রতর আলামত’ বা ‘সাধারণ আলামত’ এবং কিছু বিষয়কে ‘আলামাত কুবরা’ (العلامات الكبرى) অর্থাৎ ‘বৃহত্তর আলামত’ বা বিশেষ আলামত বলে উল্লেখ করেছেন।

কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ

‘‘তারা কি কেবল এজন্য অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত তাদের নিকট এসে পড়ুক আকস্মিকভাবে? কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে! কিয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে?’’ [সূরা মুহাম্মদ: আয়াত ১৮].

➢ **<u>আলামাত সুগরা:</u>**

উপরের আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের পূর্বাভাসসমূহ প্রকাশিত হয়েছে। এ সকল পূর্বাভাসের অন্যতম সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আগমন। সাহল ইবনু সায়িদ আস সায়িদী বলেন:

بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ أَوْ كَهَاتَيْنِ وَقَرَنَ بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى

‘‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর হাতের তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলী একত্রিত করে বলেন: ‘‘আমি প্রেরিত হয়েছি কিয়ামতের সাথে এভাবে পাশাপাশি।’’[বুখারি-৬৫০৪, মুসলিম-২৯৫১]

এভাবে আমরা দেখছি যে, খাতমুন নুবুওয়াত বা নুবুওয়াতের ধারার পরিসমাপ্তি কিয়ামতের অন্যতম পূর্বাভাস। বিভিন্ন হাদীসে কিয়ামতের আরো অনেক পূর্বাভাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কিয়ামতের পূর্বে আরব উপদ্বীপে নদনদী প্রবাহিত হবে এবং ক্ষেত-খামার ছড়িয়ে পড়বে। ইরাকের ফুরাত নদীর

তলদেশ থেকে স্বর্ণ বা সম্পদ প্রকাশিত হবে, যে জন্য ভয়ঙ্কর যুদ্ধবিগ্রহ ছড়িয়ে পড়বে। সামগ্রিকভাবে মানুষের জাগতিক উন্নতি ঘটবে, জীবনযাত্রা উন্নত হবে, অল্প সময়ে মানুষ অনেক সময়ের কাজ করবে, অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাপক হবে, অধিকাংশ মানুষ অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল ও স্বাবলম্বী হয়ে যাবে। তবে মানুষের বিশ্বাস ও ধার্মিকতা কমে যাবে, নৈতিক মূল্যবোধের ব্যাপক অবক্ষয় ঘটবে, পাপ, অনাচার ইত্যাদি ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করবে, মিথ্যা ও ভন্ড নবীগণের আবির্ভাব ঘটবে, হত্যা, সন্ত্রাস, ও বৃহৎ পরিসরের যুদ্ধ হতে থাকবে। এ সকল আলামাত প্রকাশের এক পর্যায়ে বিশেষ আলামতগুলি প্রকাশিত হবে।

''দাজ্জালের বহির্গমন, ইয়াজূজ ও মাজূজের বহির্গমন, অস্তগমনের স্থান থেকে সূর্য্যের উদয় হওয়া, আকাশ থেকে ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ এবং কিয়ামতের অন্যান্য সকল পূর্বাভাস, যা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা সবই সত্য এবং ঘটবেই। মহান আল্লাহ যাকে ইচছা সরল পথে পরিচালিত করেন।''[মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৯০-১৯৩]

- **আলামাত কুবরা:**

সাহাবী হুযাইফা ইবনু আসীদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরাফাতের মাঠে (বিদায় হজ্জের সময়ে) অবস্থান করছিলেন। আমরা তাঁর থেকে নিচু স্থানে অবস্থান করছিলাম। তিনি আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন, তোমরা কি বিষয়ের আলোচনা করছ? আমরা বললাম: আমরা কিয়ামতের আলোচনা করছি। তিনি বলেন

إِنَّ السَّاعَةَ لا تَكُونُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَالدُّخَانُ وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الأَرْضِ وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قُعْرَةِ عَدَنٍ تَرْحَلُ النَّاسَ، ونُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ...

''দশটি আয়াত বা নিদর্শন না ঘটা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না: (১) পূর্ব দিকে ভূমিধ্বস বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় (ভূপৃষ্ঠ যমীনের মধ্যে ডুবে যাওয়া), (২) পশ্চিমদিকে ভূমিধ্বস বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, (৩) আরব উপদ্বীপে ভূমিধ্বস বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, (৪) ধুম্র, (৫) দাজ্জাল, (৬) ভূমির প্রাণী, (৭) ইয়াজূজ-মাজূজ, (৮) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, (৯) এডেনের ভূগর্ভ থেকে অগ্নি নির্গত হয়ে মানুষদেরকে তাড়িয়ে নেওয়া এবং (১০) ঈসা ইবনু মরিয়াম (আঃ)-এর অবতরণ।''[সহীহ মুসলিম-২৯০১]

এ সকল আলামত সম্পকে বিস্তারিত বিবরণ সহ অনেক সহীহ হাদীস বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে সংকলন করা হয়েছে। কুরআন কারীমে কোনো আলামতের বিষয়ে ইঙ্গিত বা উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لا يُوقِنُونَ

''যখন ঘোষিত শাস্তি উহাদিগের নিকট আসবে তখন আমি মৃত্তিকা-গর্ভ হতে বাহির করব এক জীব, যা তাদের সাথে কথা বলবে, এই জন্য যে, মানুষ আমার নিদর্শনে অবিশ্বাসী।''[সূরা (২৭) নামল: ৮২ আয়াত]

অন্যত্র তিনি বলেন:

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

''আর 'আমরা আল্লাহর রাসূল মারয়াম-তনয় ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি' তাদের (ইহূদীদের) এ উক্তির জন্য। অথচ তারা তাকে হত্যা করে নি, ক্রুশবিদ্ধও করে নি; কিন্তু তাদের এরূপ বিভ্রম হয়েছিল। যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল তারা নিশ্চয় এ সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল; এ সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোন জ্ঞানই ছিলনা। নিশ্চিত যে তারা তাকে হত্যা করে নি। বরং আল্লাহ্ তাকে তার নিকট তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে তাকে বিশ্বাস করবেই এবং কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।”[সূরা নিসা: ১৫৭-১৫৯ আয়াত]

এ আয়াতে ঈসা (আঃ)-এর পুনরাগমনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাঁর পুনরাগমনের পরে তাঁর মৃত্যুর আগে সকল কিতাবীই তার বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করবে এবং ঈমান আনয়ন করবে।

ইয়াজুজ মাজুজের বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ

‘‘এমন কি যখন য়া’জুজ ও মা’জুজকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং তারা প্রতি উচ্চভূমি হতে ছুটে আসবে। অমোঘ প্রতিশ্রুতকাল আসন্ন হলে অকস্মাৎ কাফিরদিগের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, তারা বলবে ‘হায়, দুর্ভোগ আমাদিগের! আমরা তো ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন; না, আমরা সীমালংঘনকারীই ছিলাম’।’’[সূরা আম্বিয়া: ৯৬-৯৭]

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেন:

وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام من السماء وسائر علامات يوم القيامة على ما وردت به الأخبار الصحيحة حق كائن

‘‘দাজ্জালের বহির্গমন, ইয়াজূজ ও মাজূজের বহির্গমন, অস্তগমনের স্থান থেকে সূর্য্যের উদয় হওয়া, আকাশ থেকে ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ এবং কিয়ামতের অন্যান্য সকল পূর্বাভাস, যা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা সবই সত্য এবং ঘটবেই। মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।’’[মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৯০-১৯৩]

১৪। তাকদীর কী? তাকদীরে বিশ্বাসের বিষয়গুলো কর্ণনা করুন।

➢ **তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ:**

‘কাদ্র’ ও ‘কাদার’ (القَدْرُ والقَدَرُ) শব্দ মূলত পরিমাপ, পরিমান, মর্যদা, শক্তি ইত্যাদি বুঝায়। তাকদীর অর্থ পরিমাপ করা, নির্ধারণ করা, সীমা নির্ণয় করা ইত্যাদি।[১] ইসলামের পরিভাষায় ‘ঈমান বিল কাদার’ (الإيمان بالقَدَر) অর্থ আল্লাহর অনাদি, অনন্ত ও সর্বব্যপী জ্ঞান, তাঁর ইচ্ছা এবং তাঁর নির্ধারণ বা তাক্বদীরে বিশ্বাস করা। এ বিশ্বের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আল্লাহ প্রতিটি সৃষ্টির জন্য যে সুশৃঙ্খল নিয়ম, কার্যপ্রণালী বা ব্যবস্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাকেই তাক্বদীর বা আল্লাহর নির্ধারণ বলা হয়। আমরা বিশ্বাস করি যে, এই বিশ্বের ভাল মন্দ, আনন্দ, কষ্টের যা কিছু ঘটে তা সবই আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুসারে। তাঁর জ্ঞান ও ইচ্ছার বাইরে কিছুই সংঘটিত হয়না। সবকিছুই আল্লাহ নির্ধারিত ‘পরিমাপ’ বা ‘ক্বাদার’-এর মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

‘‘আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।’’[সূরা (৫৪) কামার: ৪৯ আয়াত]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ

‘‘প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ তা জনেন এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুতরই এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে।’’[সূরা (১৩) রা’দ: ৮ আয়াত]

অন্যত্র তিনি বলেন:

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ

''আমারই নিকট আছে প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার এবং আমি তা পরিজ্ঞাত পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি।''[৪]

তাকদীরে বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে অনেক মতভেদ ও বিভ্রান্তি জন্ম নেয়। এখানে তাকদীরে বিশ্বাসের মূল বিষয়গুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

➢ **তাকদীরে বিশ্বাসের বিষয়াবলি**

তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ নিম্নের ৫টি বিষয়ে বিশ্বাস করা:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلا تَضَعُ إِلا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

''আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে, অতঃপর তোমাদেরকে করেছেন যুগল! আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসবও করে না। কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না অথবা তার আয়ু হ্রাস করা হয় না, কিন্তু তা তো রয়েছে 'কিতাবে'। তা আল্লাহর জন্য সহজ।''[সূরা (৩৫) ফাতির: ১১ আয়াত]

অন্যত্র তিনি বলেন:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

''পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই কিতাবে (লিপিবদ্ধ) থাকে; আল্লাহর পক্ষে এ খুবই সহজ।''[সূরা (৫৭) হাদীদ: ২২ আয়াত]

তিনি আরো বলেন:

لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

''প্রত্যেক বিষয়ের নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ। তিনি যা ইচ্ছা মুছে ফেলেন আর যা ইচ্ছা রেখে দেন, আর তার কাছেই আছে উম্মুল কিতাব বা মূল গ্রন্থ।''[সূরা (১৩) রা'দ: ৩৮-৩৯ আয়াত]

''তবে কি তারা আল্লাহর এমন শরীক করেছে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে! বল, আল্লাহ সকল কিছুর স্রষ্টা; তিনি এক, পরাক্রমশালী।''[সূরা (১৩) রা'দ: ১৬ আয়াত।]

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

''এবং আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর তা।''[সূরা (৩৭) সাফ্ফাত: ৯৬ আয়াত।]

খ) ইসলামী তাকদীরে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও উপকারিতা আলোচনা করুন।

ইসলামী তাক্বদীরে বিশ্বাস ও অনৈসলামিক ভাগ্যে বিশ্বাসকে অনেক সময় এক করে ফেলা হয়। অনেকে মনে করেন ভাগ্য অনুসারেই যখন সবকিছু হবে তখন কর্মের কি দরকার। আমরা দেখলাম যে, এ সকল চিন্তা ওহীর বিকৃতি ও যুক্তি-তর্ক ভিত্তিক 'ধারণা' মাত্র, মক্কার কাফিরদের ধারণার মতই একটি বিকৃত ধারণা মাত্র।

যে অবিশ্বাসী তাক্বদীর নিয়ে বিবাদ করে, তাক্বদীরের দোহাই দিয়ে কর্ম ছেড়ে দেয় সে মূলত নিজেকে আল্লাহর কর্মের পরিদর্শক ও বিচারক নিয়োগ করেছে। সে বলতে চায়, কর্ম করা আমার দায়িত্ব নয়, আমার কাজ হলো আল্লাহর কাজের বিচার করা।

আর মুমিনের বিশ্বাস, আল্লাহর কর্মের বিচার করা মানুষের কর্ম নয়। তিনি কি জানেন, কি লিখেছেন, কি মুছেন আর কি রেখে দেন কিছুই মানুষকে জানাননি। কারণ, এসব জানা মানুষের কোনো কল্যাণে আসবে না। এসব কিছুই তাঁর মহান রুবূবিয়্যাতের অংশ। মানুষের দায়িত্ব আল্লাহর রহমত ও করুণার উপরে আস্থা রেখে আল্লাহর নির্দেশ মত কর্ম করা, ফলাফলের জন্য উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা মনে স্থান না দেওয়া। ইসলামের তাক্বদীরে বিশ্বাস মুসলিমকে কর্মমূখী করে তোলে, কখনই কর্মবিমূখ করেনা। তাক্বদীরে বিশ্বাসের ফলে মানুষ সকল হতাশা, অবসাদ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পায়। মুসলিম জানে যে, তার দায়িত্ব কর্ম করা, ফলাফলের জন্য দুশ্চিন্তা বা উৎকণ্ঠা তার জীবনে অর্থহীন, কারণ ফলাফলে দায়িত্ব এমন এক সত্তার হাতে যিনি তাকে তার নিজের চেয়েও ভাল জানেন, ভালবাসেন, যিনি দয়াময়, যিনি কাউকে জুলুম করেন না। যিনি তাঁর বান্দাকে কর্মের চেয়ে বেশি পুরস্কার দিতে চান। তাই মুমিন উৎকণ্ঠা মুক্ত হয়ে কর্ম করেন।

তাক্বদীরের বিশ্বাস মুসলিমকে অহংকার, অতিউল্লাস ও হতাশা থেকে রক্ষা করে। তার জীবনে সফলতা বা নিয়ামত আসলে সে অহংকারী হয়ে উঠেনা। সে জানে আল্লাহর ইচ্ছায় ও রহমতেই সে সফলতা লাভ করেছে। তার হৃদয় কানায় কানায় ভরে ওঠে কৃতজ্ঞতায়। কৃতজ্ঞ হৃদয় আর অহংকারী হৃদয়ের মধ্যে রয়েছে মানবিক ও পাশবিক হৃদয়ের পার্থক্য।

تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

''শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর নিকট দূর্বল মুমিন থেকে বেশি প্রিয় ও বেশি ভাল, তবে তাদের উভয়ের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। তোমার যাতে কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে সে বিষয়ে আগ্রহী ও সচেষ্ট হও এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর। অক্ষম, দূর্বল বা হতাশ হয়ে যেওনা। যদি তোমার কিছু হয় (যদি তুমি আশানুরূপ ফল না পাও বা ব্যর্থ হও) তবে কখনো বলবেনা: হায়, যদি আমি ঐ কাজ করতাম বা সেই কাজ করতাম তাহলে হয়ত এরূপ হতো.. (অতীতের ব্যার্থতা নিয়ে হা হুতাশ করবে না) বরং (তাক্বদীরের বিশ্বাসের বলীয়ান হয়ে) বলবে: আল্লাহর তাক্বদীরে যা ছিল হয়েছে, আল্লাহর যা মর্জি হয়েছে তাই করেছেন। কারণ, অতীতকে নিয়ে আফসোস করে ''যদি ঐ কাজ করতাম তবে হয়ত এরূপ হতো''-এ ধরনের কথা শয়তানের দরজা খুলে দেয়।''

রূপে সৃষ্টি করেন নি। তিনি তাদেরকে ব্যক্তি-রূপে সৃষ্টি করেছেন। ঈমান ও কুফ্র বান্দাদের কর্ম। কাফিরকে আল্লাহ তার কুফরী অবস্থায় কাফির হিসেবেই জানেন। যখন সে এরপর ঈমান আনয়ন করে তখন আল্লাহ তাকে তার ঈমানের অবস্থায় মুমিন হিসেবে জানেন এবং ভালবাসেন। আর এতে আল্লাহর জ্ঞান ও বিশেষণে কোনো পরিবর্তন হয় না। বান্দাদের সকল কর্ম ও নিষ্কর্মতা- অবস্থান ও সঞ্চলন সবই প্রকৃতভাবে তাদের উপার্জন, আল্লাহ তা'আলা তার স্রষ্টা। এ সবই তাঁর ইচ্ছায়, জ্ঞানে, ফয়সালায় ও নির্ধারণে। আল্লাহর আনুগত্যের সকল কর্ম আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে জরুরী এবং তা আল্লাহর মহববত, সন্তুষ্টি, জ্ঞান, ইচ্ছা, ফয়সালা ও নির্ধারণ অনুসারে। সকল পাপকর্ম আল্লাহর জ্ঞান, ফয়সালা, নির্ধারণ ও ইচ্ছার মধ্যে সংঘটিত, তবে তা আল্লাহর মহববত, সন্তুষ্টি এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে সংঘটিত নয়।''[৩]

উপরের আলোচনা থেকে তাকদীরের বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা এবং এবং আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিশ্বাস জানতে পেরেছি। এখানে মূল বিষয়, বান্দার নিজের দায়িত্ব অনুভব করা। মহান আল্লাহ বলেছেন, বান্দা তুমি কর্ম কর, আমি কখনোই কারো কর্মফল নষ্ট করব না, কারো উপর জুলুম করব না, প্রত্যেককে তার প্রত্যেক কাজের ফল দান করব। আবার তিনি বলেছেন, বান্দা আমি জানি তুমি কি করবে, আমি ইচ্ছা করলে তোমার কর্ম পরিবর্তন করতে পারি এবং আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি যেতে পার না। এখন বান্দার সামনে দুটি বিকল্প: একজন বান্দা জানে যে আল্লাহ সবই জানেন এবং তাঁর ইচ্ছার বাইরে কিছুই হয় না, সে এও জানে যে আল্লাহ তাকে কর্ম করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এখন তার মনে নানন প্রশ্ন। আল্লাহ যখন সবই জানেন তাহলে আর কষ্ট করে কি লাভ। আল্লাহ কাজ করতে বলেছেন বটে, তবে তাতে কী লাভ হবে? আল্লাহর ইলমে কী আছে আমার বিষয়ে? এভাবে বান্দা আল্লাহ জ্ঞান ও কর্মের হিসাব গ্রহণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং নিজের দায়িত্বে অবহেলা করে। এ বান্দা মূলত আল্লাহর নিদের্শেও বিশ্বাস করে নি এবং আল্লাহর ওয়াদাতেও বিশ্বাস করেনি। সে নিজেকে আল্লাহর কাজের হিসাব গ্রহণকারী বলে মনে করেছে। নিঃসন্দেহে সে ধ্বংসগ্রস্ত।

অন্য একজন বান্দা জানে যে, আল্লাহ সবই জানেন এবং তাঁর ইচ্ছার বাইরে কিছুই হয় না, সে এও জানে যে আল্লাহ তাকে কর্ম করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সে জানে আল্লাহর মহান জ্ঞান ও ইচ্ছার প্রকৃতি অনুধাবন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আমার দায়িত্বও নয়। আমি আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছায় বিশ্বাস করি এবং আল্লাহর ওয়াদা ও দয়ায় বিশ্বাস করি। আমি আমার দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করি এবং আল্লাহর সাহায্য ও দয়া চাইতে থাকি। নিঃসন্দেহে এ বান্দা সফলতার পথ পেয়েছে।

এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী (রাহ) বলেন: ''মূল তাক্বদীর হলো সৃষ্টিজগতে আল্লাহ্ তা'আলার এক রহস্য। এ সম্পর্কে আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত কোনো ফিরিশতাও যেমন অবগত নন, তেমনি কোনো নবী রাসূলও অবগত নন। এ বিষয়ে গভীরভাবে তলিয়ে দেখার চেষ্টা করা বা চিন্তা ভাবনা করার পরিনতি ব্যর্থতা, বঞ্চনা ও সীমা লংঘন ব্যতীত আর কিছুই নয়। কাজেই, এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা ও কুমন্ত্রনা হতে পূর্ণ সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং তাক্বদীরের জ্ঞান তাঁর সৃষ্টিকুল থেকে গোপন রেখেছেন এবং তাদেরকে এর তত্ত্ব উদঘাটনের প্রচেষ্টা চালানো থেকে বারণ করেছেন। আললাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্র কিতাবে বলেন: ''তিনি যা করেন সে সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা যাবে না বরং তারাই আপন কৃতকর্মের জন্য জিজ্ঞাসিত হবে।''[সূরা আম্বিয়া: ২৩ আয়াত] সুতরাং যে ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, তিনি কেন এ কাজ করলেন? সে আসলে আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করলো। আর যে ব্যক্তি কিতাবের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করে সে কাফিরদের অর্ন্তভূক্ত হয়ে যায়। এ হচ্ছে ইসলামী আক্বীদার মোটামোটি বিষয় যার প্রতি আলোজ্জল হৃদয়ের অধিকারী আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ মুখাপেক্ষী। আর এটাই্হচ্ছে সুগভীর প্রজ্ঞা সম্পন্ন ব্যক্তিদের পর্যায়। কারণ, জ্ঞান দু প্রকার, এক প্রকার জ্ঞান: যা সৃষ্টিকুলের মধ্যে বিদ্যমান (যা আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছে)। অতএব বিদ্যমান জ্ঞানের অস্বীকৃতি কুফরী কাজ এবং অবিদ্যমান জ্ঞানের (ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ যা জানান নি সেরূপ গাইবী জ্ঞান) দাবীও কুফরী কাজ। প্রকৃত ঈমান কেবল তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন বিদ্যমান জ্ঞানকে বরণ করা হয় এবং অবিদ্যমান জ্ঞানের অন্বেষণ বর্জন করা হয়। (মহান আল্লাহ যতটুকু বলেছেন ততটুকু গ্রহণ ও বিশ্বাস এবং যা বলেন নি তা নিয়ে গবেষণা বা আলোচনা বর্জন করা।)''[৫]

[১] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২০৫২।

প্রশ্ন-১৫। টীকা:

ক) মু'জেযা, কারামত, ইস্তিদরাজ

- **মু'জেযা:**

মুজিযা অর্থ 'অক্ষমকারী অলৌকিক নিদর্শন''। নবীগণ তাঁদের নুবুওয়াতের দাবি প্রমাণ করতে যে সকল অলৌকিক কর্ম বা নিদর্শন প্রদর্শন করেন সেগুলিকে মুজিযা বলা হয়।

- **কারামাত:**

কারামত (الكرامة) শব্দটির অর্থ 'ভদ্রতা', 'সম্মান', 'সম্মাননা', 'সম্মান-চিহ্ন' (nobility, dignity, respect, mark of honour, token of esteem)। ঈমান ও তাকওয়ার অধিকারী ফরয ও নফল ইবাদত পালনকারী কোনো ব্যক্তি থেকে যদি কোনো অলৌকিক কর্ম প্রকাশিত হয় তবে তাকে ইসলামী পরিভাষায় 'কারামাত' বলা হয়।

- **ইসতিদরাজ:**

ইসতিদরাজ শব্দটি আরবী 'দারাজ' (دَرَجَ) ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত, যার অর্থ চলা, হাঁটা, অগ্রসর হওয়া, ক্রমান্বয়ে এগোনো ইত্যাদি। 'দারাজাহ' (الدرجة) অর্থ ধাপ বা পর্যায়। ইসতিদরাজ (الاستدراج) অর্থ ক্রমান্বয়ে এগিয়ে নেওয়া, ক্রমান্বয়ে উপরে তোলা বা নিচে নামান, ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দেওয়া ইত্যাদি (To make advance gradually, promote gradually, to entice, tempt, lure into destruction)।

কোনো পাপী বা অবিশ্বাসী ব্যক্তি থেকে কোনো অলৌকিক কর্ম প্রকাশিত হলে তাকে ইসলামের পরিভাষায় 'ইসতিদরাজ' বলা হয়।

খ) কুফরঃ

- **কুফরীর আভিধানিক অর্থ-** অস্বীকার করা, আবৃত করা, লুকিয়ে ফেলা ও সত্যকে গোপন করা।

আরবী 'কুফর' (الْكُفْرُ) শব্দটি অবিশ্বাস, অস্বীকার, অকৃতজ্ঞতা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। শব্দটির মূল অর্থ 'আবৃত করা'।

ঈমান বা বিশ্বাসের বিপরীত অবিশ্বাসকে 'কুফর' বলা হয়; কারণ অবিশ্বাস অর্থ সত্যকে অবৃত করা। অকৃতজ্ঞতা বা নিয়ামত অস্বীকার করাকে কুফর বলা হয়; কারণ এতে নিয়ামত লুকানো হয় এবং আবৃত করা হয়।"

- **কুফরের পারিভাষিক অর্থঃ**

ইসলামী পরিভাষায় বিশ্বাসের অবিদ্যমানতাই কুফর বা অবিশ্বাস। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর এবং ঈমানের রুকনগুলিতে বিশ্বাস না থাকাকেই ইসলামের পরিভাষায় 'কুফর' বলে গণ্য। অস্বীকার, সন্দেহ, দ্বিধা, হিংসা, অহঙ্কার, ইত্যাদি যে কোনো কারণে যদি কারো মধ্যে 'ঈমান' বা দৃঢ় প্রত্যয়ের বিশ্বাস অনুপস্থিত থাকে তবে তাকে ইসলামী পরিভাষায় 'কুফর' বলে গণ্য করা হয়।

গ) নিফাকঃ

আরবীতে 'নিফাক' শব্দের অর্থ কপটতা (hypocrisy)। শব্দটির মূল অর্থ খরচ করা, চালু করা, গোপন করা, অস্পষ্ট করা ইত্যাদি। নিফাকে লিপ্ত মানুষকে 'মুনাফিক' বলা হয়।

ভালো প্রকাশ করা আর ভিতরে মন্দ গোপন রাখাকে নিফাক বলে।

ঘ) প্রধান ৪ ফেরেশতাঃ

প্রধান ৪ ফেরেশতা হলো -

(ক) হযরত জিবরাইল (আ.) (খ) হযরত মিকাইল (আ.)

(গ) হযরত ইসরাফীল (আ.)) (ঘ) মালাকুল মাউত বা আজরাইল (আ.)

ঙ) মুনকার নাকীরঃ

মুনকার ও নাকির (অস্বীকারকারী ও তিরস্কারকারী) দুজন ফেরেশতার নাম। এই দুটি শব্দের ভেতর অস্বীকার ও অপরিচিত হওয়ার অর্থ আছে। কবরে এসে মৃত ব্যক্তিকে দুজন ফেরেশতা প্রশ্ন করবেন, যাদের অদ্ভুত চেহারা ও ভীতিপ্রদ অবয়ব থাকবে। তাঁদের এই নাম দেওয়ার কারণ হলো, তাঁরা উভয়ে মৃত ব্যক্তির কাছে অপরিচিত কিংবা পাপী মৃত ব্যক্তিরা তাঁদের অস্বীকার করে।

চ) বারযাখঃ

বারযাখ হল একটি আরবি শব্দ, যার অর্থ হল বাধা, প্রতিবন্ধক, বিচ্ছেদ, দেয়াল, দু'টি বস্তুর মধ্যে আড়াল।

ইসলামী পরিভাষায়, বারযাখ হল মৃত্যু পরবর্তী কবরের রুহানী বা আত্বিক জীবন, যেখানে ব্যক্তি তার জীবনের কর্মফল প্রাথমিকভাবে ভোগ করে এবং কেয়ামত বা শেষ বিচারের দিন না আসা পর্যন্ত এভাবে তা চলমান থাকে।

মানুষের ইহজীবন ও কিয়ামতের মধ্যবর্তী যে জগৎ লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়েছে তাকে আলমে বারজাখ বা মধ্যবর্তী জগৎ বলা হয়। মানুষের মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত এর সময়কাল।

ছ) রিসালাত:

রিসালাত আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ বার্তা, চিঠি বা সংবাদ বহন অথবা কোন শুভ কাজের দায়িত্ব বহন করা।

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বীয় বান্দাদের হেদায়াত লাভের নিমিত্তে তাদের মধ্য থেকে মনোনীত বান্দাকে আল্লাহর বাণী ও বিধিবিধান মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার যে বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করেছেন তাকে রিসালাত বলে। আর ঐ মনোনিত বান্দা অর্থাৎ যাদেরকে রিসালাতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তারা হলেন রাসূল।

জ) আদম (আ.):

বিশ্ব ইতিহাসে প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী হিসাবে আল্লাহ পাক আদম (আলাইহিস সালাম)-কে নিজ দু'হাত দ্বারা সরাসরি সৃষ্টি করেন (ছোয়াদ ৩৮/৭৫)। মাটির সকল উপাদানের সার-নির্যাস একত্রিত করে আঠালো ও পোড়ামাটির ন্যায় শুষ্ক মাটির তৈরী সুন্দরতম অবয়বে রূহ ফুঁকে দিয়ে আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের আদি পিতা। মানব জাতির সৃষ্টি হয়েছে তার থেকে।

ঝ) নূহ (আ.):

'আবুল বাশার ছানী' (ابوالبشر الثانى) বা মানবজাতির দ্বিতীয় পিতা বলে খ্যাত নূহ (আলাইহিস সালাম) ছিলেন পিতা আদম (আলাইহিস সালাম)-এর দশম অথবা অষ্টম অধঃস্তন পুরুষ। তিনি ছিলেন দুনিয়াতে ১ম রাসূল।

নূহ (আঃ)-এর চারটি পুত্র ছিলঃ সাম, হাম, ইয়াফিছ ও ইয়াম অথবা কেন'আন। প্রথম তিনজন ঈমান আনেন। কিন্তু শেষোক্ত জন কাফের হয়ে প্লাবনে ডুবে মারা যায়।

ঞ) ইবরাহীম (আ.)

ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ছিলেন হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্ভবত: এগারোতম অধঃস্তন পুরুষ। নূহ থেকে ইবরাহীম পর্যন্ত প্রায় ২০০০ বছরের ব্যবধান ছিল। হযরত ছালেহ (আঃ)-এর প্রায় ২০০ বছর পরে ইবরাহীমের আগমন ঘটে। ঈসা থেকে ব্যবধান ছিল ১৭০০ বছর অথবা প্রায় ২০০০ বছরের। তিনি ছিলেন 'আবুল আম্বিয়া' বা নবীগণের পিতা এবং তাঁর স্ত্রী 'সারা' ছিলেন 'উম্মুল আম্বিয়া' বা নবীগণের মাতা। তাঁর স্ত্রী সারার পুত্র হযরত ইসহাক্ব-এর পুত্র ইয়াকূব (আঃ)-এর বংশধর 'বনু ইসরাঈল' নামে পরিচিত এবং অপর স্ত্রী হাজেরার পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশে জন্ম নেন বিশ্বনবী ও শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ(ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)। যাঁর অনুসারীগণ 'উম্মতে মুহাম্মাদী' বা 'মুসলিম উম্মাহ' বলে পরিচিত।

ট) মুসা (আ.)

মূসা ইবনে ইমরান (আ.) । মূসা হ'লেন ইবরাহীম (আঃ)-এর ৮ম অধঃস্তন পুরুষ। মূসা (আঃ)-এর পিতার নাম ছিল 'ইমরান' ও মাতার নাম ছিল 'ইউহানিব'। তাঁর সহোদর ভাই হারূণ (আঃ) ছিলেন তাঁর চেয়ে তিন বছরের বড় এবং তিনি মূসা (আঃ)-এর তিন বছর পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। মূসা (আ.) চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভ করেছিলেন। সেমতে আমরা মূসা (আঃ)-এর বয়সকে নিম্নরূপে ভাগ করতে পারি। যেমন, প্রথম ৩০ বছর মিসরে, তারপর ১০ বছর মাদিয়ানে, তারপর মিসরে ফেরার পথে তূর পাহাড়ের নিকটে 'তুবা' (طُوَى) উপত্যকায় ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভ। অতঃপর ২০ বছর মিসরে অবস্থান করে সেখানকার অধিবাসীদেরকে তাওহীদের দাওয়াত প্রদান। তারপর ৬০ বছর বয়সে বনু ইসরাইলদের নিয়ে মিসর হ'তে প্রস্থান এবং ফেরাউনের সলিল সমাধি। অতঃপর আদি বাসস্থান কেন'আন

অধিকারী আমালেক্কাদের বিরুদ্ধে জিহাদের হুকুম অমান্য করায় অবাধ্য ইস্রাঈলীদের নিয়ে ৪০ বছর যাবত তীহ্ প্রান্তরে উন্মুক্ত কারাগারে অবস্থান ও বায়তুল মুক্বাদ্দাসের সন্নিকটে মৃত্যু সম্ভবতঃ ৮০ থেকে ১০০ বছর বয়সের মধ্যে। মূসা (আঃ)-এর কবর হয় বায়তুল মুক্বাদ্দাসের উপকণ্ঠে।

তার বড় ভাইয়ের নাম ছিল হারুন (আ.)। তিনি মুসা (আ.) এর থেকে ৩ বছরের বড় ছিলেন। উভয়ের মৃত্যু হয় মিসর ও শাম-এর মধ্যবর্তী তীহ্ প্রান্তরে বনু ইস্রাঈলের ৪০ বছর আটক থাকাকালীন সময়ে।

ঠ) মীযানঃ

মিযান শব্দটি আরবি। এর অর্থ মাপযন্ত্র, পরিমাপক বা দাঁড়িপাল্লা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, হাশরের দিন আল্লাহ বান্দার পাপ-পুণ্যের হিসাব নেওয়ার জন্য যে যন্ত্র বা মাপকাঠি ব্যবহার করবেন তাকে মিযান বলে।

ড) সীরাতঃ

সিরাত/সীরাত শব্দটি আরবি। সিরাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- জীবন, যাত্রা, অবস্থা, রাস্তা বা পথ। সিরাত শব্দের পারিভাষিক অর্থ- মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সার্বিক জীবন চরিতকে সীরাত বলে। সীরাতের আরেকটি অর্থ হতে পারে- নবী ও আউলিয়াগনদের কর্ম, চিন্তা ভাবনা এবং সর্বোপরি জীবন পদ্ধতি বা জীবন চরিত্র।

ঢ) শাফায়াতঃ

শাফায়াত শব্দের অর্থ- সুপারিশ করা, অনুরোধ করা, কারো দাবি বা আব্দারকে সমর্থন করা। শব্দটি 'আশ-শাফউ (الشفع) থেকে গৃহীত, যার অর্থ জোড়া বা জোড়া বানানো। শাফায়াত অর্থ- পাপ বা অপরাধের শাস্তি না দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করা।

ইসলামী পরিভাষায়- কল্যাণ ও ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার কাছে নবী-রাসূল ও নেক বান্দাগণের সুপারিশ করাকে শাফায়াত বলে। কিয়ামতের দিন পাপীদের ক্ষমা ও পাপ মার্জনার জন্য এবং পুণ্যবানদের মর্যাদা বৃদ্ধি ও কল্যাণ লাভের জন্য শাফায়াত করা হবে।

ণ) জান্নাত-জাহান্নামঃ

জান্নাত

জান্নাত শব্দের অর্থ বাগান, উদ্যান, আবৃত স্থান ইত্যাদি।

আখিরাতে নেককার মুমিনগণের জন্য যে মহা-নিয়ামতপূর্ণ আবাসস্থল আল্লাহ তৈরি করে রেখেছেন তাকে ইসলামী পরিভাষায় ''জান্নাত'' বলা হয়।

জাহান্নাম

জাহান্নাম শব্দের মূল অর্থ ''গভীরগর্ত কূপ''। মহান আল্লাহ আখিরাতে অবিশ্বাসী ও পাপীদের শাস্তির জন্য যে অগ্নিময় আবাস তৈরি করেছেন তাকে কুরআন-হাদীসে ''জাহান্নাম'' বলা হয়েছে।